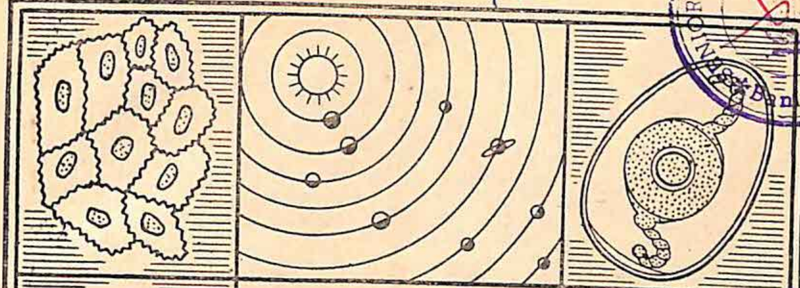
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

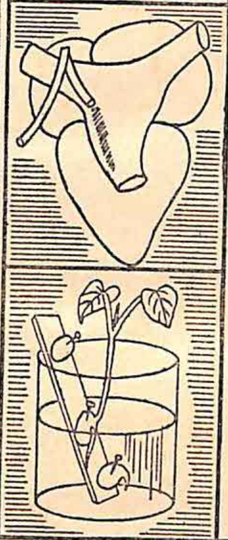


শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

বিজ্ঞান-সাধক-চরিতমালা

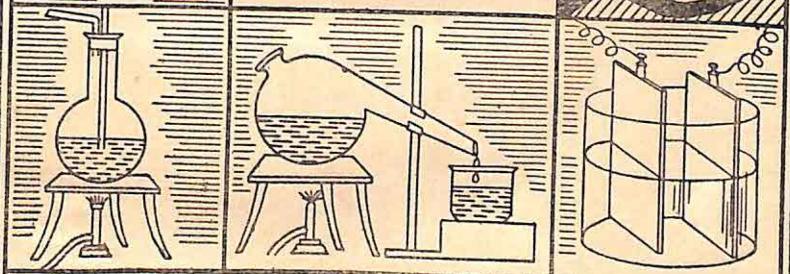
ওরিয়েণ্ট
বুক কোম্পানি





আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু





শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত



ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি





আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস-সি.

'*Two New Pala Records*' ও 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়'-এর গ্রন্থকার ; প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, Science & Culture, Journal of the Asiatic Society প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ; বেঙ্গল কেমিক্যালের রাসায়নিক

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ঃ পনরই আগষ্ট, ১৯৫৮
আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতিবার্ষিকী বর্ষ
দাম ঃ এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস প্রাইভেট
লিমিটেড, ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

নিবেদন

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের উত্তর পার্শ্বে একটি অতি কারুকার্য-খচিত নয়ন-মোহন মন্দির দেখা যায়। এই সম্ভ্রম উদ্রেককারী সৌধের নাম, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। এই মন্দিরের অঙ্গনে সর্বজাতি ও ধর্মীয় দেবতার পূজার জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত আছে। কিন্তু বসু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপিত হয়েছে, প্রধানত বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আরাধনার জন্য। মন্দির-স্থাপয়িতা ও প্রথম পুরোহিত হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্র এদেশের জনসাধারণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন জগতের জ্ঞানসভার একজন প্রধান আচার্য। তাঁর প্রজ্ঞা ও সাধনায় ভারতের গৌরব দেশে দেশে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে উৎস হতে তিনি বিজ্ঞানের এই গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছিলেন তা তাঁর গভীর দেশপ্রেম।

বাংলা দেশের মহাসৌভাগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কয়েকটি ঋষি এদেশে জন্মগ্রহণ করে দিকে দিকে জাতির গৌরব-বর্ধনকারী কর্মের সূচনা করেছিলেন। তাঁদের বিস্মৃতপ্রায় জীবন-কথা আজিকার এই হৃততেজ হতভাগ্য বাঙালীর চরিত্রে যদি সম্বিত নিয়ে আসে, এই আশায় জগদীশচন্দ্রের জীবন ও চরিত্র চিত্রণের এই স্বল্লায়তন প্রয়াস।

৯ই, যোগোদ্যান লেন,
কলকাতা-১১
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৫

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

সূচীপত্র



জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনপঞ্জী

খৃষ্টাব্দ

১৮৫৮ ঢাকা জেলার রাড়িখাল গ্রামের বসুপরিবারে ৩০শে নভেম্বর জন্ম। জন্মস্থান ময়মনসিংহ সহর। তখন তাঁহার পিতা সেখানে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট। পাঁচ বৎসর বয়সে ফরিদপুরে বাংলা স্কুলে শিক্ষা আরম্ভ

১৮৬৯ কলকাতা হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন; তিনমাস পরে সেণ্টজেভিয়ার্সে; ১৬ বৎসর বয়সে সেখান হতে প্রবেশিকা পাশ করেন; ৪ বৎসর পর সেখান হতেই বি-এ পাশ করেন

১৮৭৯ লণ্ডনে ডাক্তারী পড়া আরম্ভ; তা ছেড়ে

১৮৮০ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাইষ্ট কলেজে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন আরম্ভ

১৮৮৩ কেম্‌ব্রিজে ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি হলেন

১৮৮৪ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন

১৮৯৪ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টির নবতর যন্ত্র তৈরি ও গবেষণা করেন

১৮৯৫ কলকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি গৃহে মৌলিক গবেষণালব্ধ ফলের প্রথম বিবরণী পাঠ। Electrician পত্রে দুইটি মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ। রয়াল সোসাইটি হতে বৃত্তিলাভ। কলকাতা টাউন হলে বিস্ময়কর পরীক্ষাদি সম্বলিত বক্তৃতা দান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস-সি উপাধি লাভ। বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের সূচনা। জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার ব্যয় নির্বাহ জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৫০০৲ মঞ্জুর করলেন

খৃষ্টাব্দ	
১৮৯৬	নিজ আবিষ্কারের প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইউরোপে প্রেরিত হন। ইউরোপে জয়মাল্য
১৮৯৭	ইউরোপ হতে প্রত্যাবর্তন ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সখ্য
১৯০০/১	বাঙ্গালা ও ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রূপে প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে প্রেরিত হন ধাতুর সাড়ালিপি প্রদর্শন ও প্রচার। জীববিদ্যা-বিশারদগণ কর্তৃক অস্বীকৃত। তাঁদের স্বমতে আনয়ন জন্য লণ্ডনে থেকেই আরও গবেষণা ও প্রচার। এই কাজের ব্যয় নির্বাহ জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা মতে ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর ২০,০০০৲ অর্থ সাহায্য প্রদান করেন
১৯০১/২	আচার্য বসু কর্তৃক তাঁর উদ্ভাবিত বেতার যন্ত্রের পেটেণ্ট গ্রহণে অসম্মতি। বিলাতে আচার্য বসুর গবেষণার ফল সর্ব-বিভাগীয় বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা স্বীকৃত
১৯০৩	দিল্লী দরবারে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হলেন
১৯০৭	সেপ্টেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট তৃতীয় বার তাঁকে পাশ্চাত্য দেশে পাঠালেন। সেখানকার বৈজ্ঞানিকগণ জানালেন যে ডাঃ বসুর আবিষ্কার স্বীকৃত হবে যদি তিনি স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা তা প্রমাণিত করেন। ...ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে পরীক্ষা করে দেখালেন
১৯০৯	দেশে প্রত্যাগমন
১৯১০	পরীক্ষার ফলগুলি সর্বত্র গৃহীত এবং তৎফলে ফিলজফিক্যাল ট্রানজ্যাকসনে প্রকাশিত
১৯১১	সম্রাটের করোনেশনে সি-এস-আই উপাধিলাভ। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত

খৃষ্টাব্দ

১৯১৩ অধ্যাপকতা হতে অবসর নেবার কথা। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আরও দুই বৎসর কার্যকাল বৃদ্ধি করলেন

১৯১৪ জগতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে আচার্য বসুর আবিষ্কার প্রচারের জন্য চতুর্থবার ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বিদেশে পাঠান

১৯১৫ কার্যকাল শেষ হল। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে শেষ পূরা বেতনে আজীবন Emeritus Professor নিযুক্ত করলেন

১৯১৬ 'নাইট' উপাধি লাভ

১৯১৭ ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা

১৯১৯/২০ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পঞ্চমবার পাশ্চাত্য দেশে প্রেরিত; অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এল-এল-ডি উপাধি প্রদান

১৯২০ রয়াল সোসাটির সদস্য নির্বাচিত

১৯২৬/২৭ League of Nations Intellectual Co-operation কমিটির সভ্যরূপে পাশ্চাত্য দেশে গমন

১৯২৮ ১লা ডিসেম্বর কলকাতায় সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব

১৯৩৪ প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্বর্ধনা

১৯৩৭ ২৩শে নভেম্বর মৃত্যু, গিরিডিতে, ৮০ বৎসর বয়সে। ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরস্থিত সার্বজনীন মন্দিরে অস্থি-ভস্ম রক্ষিত।

অর্জনের সাহায্য চাইলে তাকে শিশু জগদীশচন্দ্রের ভৃত্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর স্বভাবের এই বৈচিত্র্য তাঁকে বহুজনের প্রিয় ও শত্রু করেছিল। কিন্তু স্বদেশবাসীর মঙ্গল তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল; তাই তাঁর জীবনের গতিতে কোন দ্বিধা ছিল না। ঐ ডাকাত ভৃত্য একবার নৌকাযোগে রাড়িখাল যাওয়ার সময় তাঁর পরিবারকে জলদস্যুর হাত হতে রক্ষা করেছিল। মুসলমান প্রতিবেশীরা তাঁর বাড়ীর আগুন নিভাতে ছুটে এসেছিল এবং একবার এক আততায়ী তাঁর কাছে স্বীয় দোষ স্বীকার করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের জীবন গঠনের জন্য ভগবানচন্দ্রের ব্যবস্থাও কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। এই শিশু ডাকাত-সর্দারের কাছে তার কঠিন ও দুর্ধর্ষ জীবনের গল্প শোনে, ঠাকুমার কাছে শোনে রূপকথা, যাত্রাগান শুনে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও তত্ত্ব জানার হয় তাঁর সূচনা, টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে চড়ে হয় তাঁর শরীরের দৃঢ়তা ও পশুপালনের দীক্ষা। নদীর স্রোত, তরুলতার প্রকৃতি, তাদের ফুল ও ফলের পরিণতি, গৃহপালিত পশুগুলির জীবন তার দৃষ্টি ও মনের সূত্রে হয় গাঁথা। শিশু যা দেখে তাই তাঁর মনে নানা প্রশ্ন নিয়ে আসে। নদীর জলে কেন স্রোত, তা কচুপাতা কেন দ্রুত ভাসিয়ে নেয়, তরুলতা কেন ধীরে ধীরে বড় হয়, আগুন জ্বললে কেন পতঙ্গ উড়ে উড়ে আসে! ভগবানচন্দ্র সারাদিনের কর্মক্লান্তির পরও ছেলের এই প্রশ্ন এড়িয়ে যান না। যথাশক্তি উত্তর দেন, আর বলেন, বড় হও, নিজেই এর কারণ আবিষ্কার কর।

ডেপুটীর ছেলে, সবাই ভেবেছিলেন, ভগবানচন্দ্র ছেলেকে ফরিদপুরের ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করবেন। তাঁর কেরানীর ছেলেরাই তখন সেই স্কুলে পড়ত। কিন্তু পিতা স্বপ্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলেই জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করে দিলেন। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর, কিন্তু সেই বয়সেই তিনি পিতার কাছে টাট্টু ঘোড়া উপহার পেয়ে সদর্পে চড়ে বেড়ান। এই ছেলের প্রকৃতিও অন্যের তুলনায় আলাদা।

এই ছেলে বাড়ীর আঙ্গিনায় বাগান করে, তাতে মাটি খুঁড়ে সৃষ্টি হয় দীঘির ক্ষুদ্র সংস্করণ; তাতে ব্যাঙ, মাছ আর হেলে সাপ নিজেই ধরে এনে ছেড়ে দেয়; ছোট ঘর তৈরি করে তাতে রেখে দেয় খরগোস, কাঠবিড়ালী। বীজ পুঁতে অঙ্কুর গজালে ভেঙে ভেঙে দেখে কি তার গঠন, কোথায় তার মূল। ঠাকুমার শিবপূজার পর পরিত্যক্ত মাটির শিব-লিঙ্গ নিয়ে তাকে জল দিয়ে আরও নরম করে নিয়ে গড়ায় চোখে-দেখা কত জীবের অবয়ব। ভগবানচন্দ্র ছেলের এই সব সখ দেখে তৃপ্তি পান, বোনেরা তাঁর খেলার সাথী হয়, সঙ্গে সঙ্গে চলে বাংলা স্কুলের পড়া ও সহপাঠীদের সঙ্গে নদীতীরে, বনে ও প্রান্তরে বেড়ান। আকাশের তারা কেন ছোটে, কোথায় যায়, এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না।

কলকাতায় পড়াশুনা

ভগবানচন্দ্র বর্ধমানে সহকারী কমিশনাররূপে বদলী হয়ে গেলেন (১৮৬৯), জগদীশচন্দ্রের ফরিদপুরের পড়াও শেষ হল। তখন তাঁর ১০ বৎসর বয়স। এবার পিতা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে, এবং তিনমাস পরেই একবারে ইউরোপীয় মিশনারী সাহেব পরিচালিত কলকাতার বিখ্যাত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ-স্কুলে। ইংরাজীতে তাঁকে পাকা করা চাই। রেখে দিলেন হোষ্টেলে, পারিবারিক আবেষ্টনের বাইরে।

এই মফঃস্বলের 'বাঙাল' ছেলে স্কুলের বয়সে বড়, অধিকাংশ ইউরোপীয় ছেলেদের কাছে পাত্তা পেল না। ইংরাজী সদ্য শিখছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলাও শক্ত। যেমন হয়, তারা তাঁকে মাঝে মাঝেই উত্যক্ত করে কাঁদাত। একদিন রাগে ক্ষোভে ফুলে ফুলে কেবল অন্তরের বীর্য সম্বল করে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এই বালক—

আত্ম-সম্মান রক্ষার্থ সেই অভিযান জয়যুক্ত হল—অর্জিত হল ক্লাশে সমানাধিকার—সম্ভ্রম সৃষ্টি হল তাঁর, সহপাঠীদের কাছে।

যে হোষ্টেলে তিনি থাকতেন তার অধিবাসীরা সবাই কলেজের ছেলে, তারা বয়সে বড়। তাদের সঙ্গে খেলা চলে না। হোষ্টেলেই তিনি ফরিদপুরের মত বাগান সৃষ্টি করলেন, তাতে জলবাহী নল দিয়ে স্রোতস্বতী করলেন, উপরে দিলেন ক্ষুদ্র সেতু। খরগোস, কবুতর প্রভৃতিও পুষতে লাগলেন—গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন। এই সব সখ পরিণত বয়সেও পরিত্যক্ত হয় নি। তখন তাঁর দার্জিলিং ও কলকাতার বাড়ীতে ঐরূপ জলের উপর সেতু তিনি তৈরী করেছিলেন—এমনি করে তিনি শৈশব-স্মৃতির সুখ-স্পর্শ পেতেন।

ষোল বছর বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন। অধ্যাপক লাফোঁর তখন দেশব্যাপী খ্যাতি। পদার্থবিদ্যার নানা পরীক্ষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। ছাত্রদল তাঁর অধ্যাপনায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করত। জগদীশচন্দ্র তাঁর ছাত্র হলেন এবং কালে কালে তাঁর গুরুর পরীক্ষার দক্ষতাও অতিক্রম করে সমগ্র জগতে এ বিষয় অধিকতর যশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। আই. এ. থেকে বি. এ. তিনি পাশ করলেন। ভালই পাশ করলেন। ইংলণ্ডে যাওয়ার তাঁর অভিলাষ হল। উচ্চ আশা, কিন্তু অজানা সে পথ। অধীত বিদ্যা তাঁর আয়ত্তে, আরও জানা ও শেখার আকাঙ্ক্ষা তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি কি পড়বেন? ব্যয় নির্বাহেরই বা কি উপায়? পিতার অর্থ নানা শিল্প-প্রচেষ্টায় বিপন্ন, রোগ হেতু তিনিও তখন চাকুরী হতে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আছেন। গেলেই বা কি পড়া যায়? সিভিল সার্ভিস? ভগবানচন্দ্র রাজী হলেন না, তাঁরা স্বদেশবাসী হতে পৃথক হয়ে যায়। স্বদেশীয়দের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাদের কোন যোগ থাকে না। ডাক্তারী? তা বেশ,

লোকসেবার সুযোগ হবে। নিজে ম্যাজিষ্ট্রেট, তবু সিভিল সার্ভিসের প্রতি এই বিরাগ! ভগবানচন্দ্রের এই মনোভাব তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ। তাই এই সুযোগে জগদীশচন্দ্রের পিতামাতার চরিত্রের পরিচয় এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হচ্ছে।

পিতামাতার চরিত্র ও প্রভাব

সৌভাগ্যক্রমে জগদীশচন্দ্রের নিজের লেখাতেই তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'আমার পিতৃদেব ৺ভগবানচন্দ্র বসুর কথা... তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।......অর্ধশতাব্দীর পূর্বের কথা...... তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনিই বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথম ফরিদপুরে লোন আপিস হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা-বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন।

জীবনের শেষভাগে দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়তো একথা তাঁহার জীবনে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। (বোধন, ১৯১৫) ...তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।" (নিবেদন)

বিদেশী গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও দেশীয় লোকের উন্নতি বিধানের জন্য উপরোক্তরূপ প্রচেষ্টা ভগবানচন্দ্রের অনন্য-সাধারণ মনস্বিতা ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিচ্ছে। ফরিদপুর হতে তিনি ১৮৬৯ সালে সহকারী কমিশনার হয়ে বর্ধমানে আসেন। সহসা দারুণ ম্যালেরিয়া রোগ হেতু সেই সময় হাজার হাজার লোকের সেখানে মৃত্যু হয়। তাদের নাবালক শিশুদের উপার্জনের জন্য ভগবানচন্দ্র নিজ বাংলো-বাড়ীর খালি জমিতেই কাঠ ও পিতলের মিস্ত্রিখানা সমেত একটি লোহা ও পিতল ঢালাইর কারখানা খুলে দেন। জগদীশচন্দ্র এখানে ছুটির সময় কাজ করে করে যন্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। উত্তর কালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরির সময় এই অভ্যাস তাঁর খুব কাজে লেগেছিল।

এখান থেকে ভগবানচন্দ্র কাটোয়ার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে বদলী হন (১৮৭৫)। সেখানকার কুখ্যাত দুর্ভিক্ষে সাহায্য দানের কাজে ঘোড়ায় চড়ে তিনি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। নিরন্নদের মধ্যে অনেক সময় তাঁর আহারে প্রবৃত্তি হত না। কখনও বা অনভ্যস্ত আহার্য অল্প পরিমাণে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। বিশ্রাম ও নিদ্রা থেকেও তিনি বঞ্চিত হতেন। এই

সাহায্য দানের কাজ তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে এমন যোগসূত্রে গাঁথা ছিল যে তাঁর শরীর দিন দিন অপটু হয়ে পড়লেও তিনি গ্রাহ্য করছিলেন না। অবশেষে শরীর প্রতিশোধ নিয়ে তাঁকে শয্যাশায়ী করে দিল। প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী ছুটি নিতে বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতায় এসে থাকলেন। এই পিতার চরিত্রের প্রভাব জগদীশচন্দ্রের জীবনে কতখানি ছিল তা আমরা তাঁর লেখাতেই পেয়েছি। তাঁর মায়ের চরিত্রও তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিল। তাঁর লেখাতেই পাচ্ছি —'শৈশবে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরাজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র ও বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। ...ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ি ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলে বেলার সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ. পাশ করার পর জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়ে উচ্চ বিদ্যা লাভের আশা পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর পিতার অর্থসংকট এই অভিলাষ পূরণের অন্তরায় ছিল। তা দেখে তিনি সে বাঞ্ছা চেপে রেখে এখানেই কোন জীবিকার ব্যবস্থা করা যায় কি না চিন্তা করতে লাগলেন। বিদেশ গমন তাঁর মায়েরও অনভিপ্রেত ছিল; মাত্র ১০ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্রের ছোট ভাইটির মৃত্যু হয়। তাই এই একমাত্র পুত্রের বিদেশ গমন তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমর্থন পায় নি। কিন্তু অচিরে তিনি পুত্রের অভিপ্রায় বুঝে অন্তর দৃঢ় করলেন এবং একদিন রাত্রে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে এসে বললেন, 'এই ইউরোপ যাওয়ার মূল্য আমি ঠিক বুঝিনা, কিন্তু তুমি

নিজেকে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাও। সে বাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হোক্। তোমার বাবার সম্বল নষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমার গহনা ও নগদ টাকা কিছু সঞ্চিত আছে। তা দিয়েই সব হবে। তুমি যাত্রার উদ্যোগ কর।'

বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা

ইতিমধ্যে ভগবানচন্দ্র অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং পাবনায় গিয়ে কাজে যোগ দিলেন। সুতরাং অর্থের অভাব আর তেমন রইল না। যদিও ঋণের সুদ ও জগদীশচন্দ্রের বিলাতের খরচ বহন জন্য তাঁকে সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ করতে হল।

১৮৭৯ সনে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। তাঁর কলকাতার ডিগ্রী সেখানে এণ্ট্রান্সের যোগ্য বিবেচিত হল। প্রথমে সুরু হল পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন; তারপর প্রাণিবিজ্ঞান। কিছু পরে যোগ হল উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। প্রথম বৎসরের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হলে সত্যিকারের ডাক্তারী পড়া সুরু হল—শবব্যবচ্ছেদ সমেত শরীর-বিদ্যা।

কলকাতা কলেজে যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তেন, তখন এক ছুটিতে তিনি এক সহপাঠীর আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে আসামে বেড়াতে যান। জগদীশচন্দ্রের বন্দুক ছোঁড়ার অভ্যাস ছিল। ইতিপূর্বে ১৯ বৎসর বয়সে একবার তিনি হিমালয়ের পাদদেশে তরাই এর জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। আসামের জঙ্গলে শিকারের জন্যই ছিল এই আমন্ত্রণ। সেখানে গিয়ে তাঁর যে জ্বর হয় তা কুইনিনে সারে না। জ্বর নিয়েই তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানে মাঝে মাঝেই এ রোগ দেখা দিত। লণ্ডনের পথে জাহাজেও তিনি এই জ্বরে মরণাপন্ন কাতর হয়েছিলেন। সেই জ্বর লণ্ডনে পুনঃ পুনঃ তাঁকে শয্যাশায়ী করে পড়াশুনায় ব্যাঘাত জন্মাত।

(হয়তো এ রোগ ছিল কালা-আজর—যার ঔষধ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি) শবব্যবচ্ছেদের সময় দুর্গন্ধে তাঁর এই জ্বর খুব বৃদ্ধি পেল। তাঁর অধ্যাপকরা তাঁর অবস্থা দেখে শঙ্কিত হলেন। বললেন, 'এই খাটুনির পড়া তোমার সইবে না, কি আর করবে, অন্য কিছু সহজ লাইন নাও।'

অগত্যা জগদীশচন্দ্র কেমব্রিজে পড়তে গেলেন এবং পরীক্ষা দিয়ে একটি বৃত্তি পেয়ে ক্রাইষ্টস্ কলেজে বিজ্ঞান-ক্লাসে ভর্তি হলেন (১৮৮০/৮১)। কিন্তু ঐ জ্বর তাঁর সাথী হয়ে থাকল। ঔষধাদি চিকিৎসা পরিত্যাগ করে তখন তিনি প্রত্যহ নৌকায় দাঁড় টানা আরম্ভ করলেন। ফরিদপুরে পদ্মা নদীতে যা তাঁর সখের কল্পনা ও খেলা ছিল, ক্যাম নদীতে তা তিনি স্বয়ং সুরু করে দিলেন—প্রত্যহ ঐ শীতের দেশেও খানিকটা ঘাম বেরিয়ে যেত। জ্বরও যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে এল। এরপর কদাচিৎ দেখা দিত, কিন্তু তিনি ক্রমে যেন তা থেকে মুক্ত হয়ে এলেন।

কেমব্রিজের অধ্যাপকগণও তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন। তাঁদের প্রভাবে তিনি এমন ছাত্রদলের বান্ধব হলেন যাঁরা তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের সহযোগী হলেন। এই বান্ধবগণ পরবর্তী জীবনেও তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন। থিয়োডোর বেক্ আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আর সিপলে ক্রাইষ্টস্এর। সিপলে উপরে পড়তেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে ভালবাসতেন। পদার্থবিদ্যার গবেষণাবিদ ফিজপ্যাট্রিকের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল, এবং উদ্ভিদবিদ রেনল্ড গ্রিন ছিলেন তাঁর বন্ধু। বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগে তিনি বেশী মনোযোগী হবেন তা তিনি প্রথমে ঠিক করতে পারলেন না। যেখানে যা পড়ান হয়, বিশেষত বিজ্ঞানের পরীক্ষা (experiments), তা তিনি শুনে ও দেখে বেড়াতে লাগলেন। সারাদিন কোন বিরতি নেই। মাইকেল ফষ্টারের মত প্রাণি-বিদ্যার, ফ্রান্সিস্ বালফুরের মত ভ্রূণ-বিদ্যার অধ্যাপক দুর্লভ। অধ্যাপক হিউজেস্ ভূতত্ত্ববিদ্যার দিকেও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। অবশেষে তিনি পদার্থবিদ্যা,

রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা পড়াই স্থির করলেন। রসায়ন ও উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন লাইভিং ও ভাইন্‌স্। কিন্তু পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক লর্ড র‍্যালের পরীক্ষা ও বক্তৃতা আরও সূক্ষ্ম ও চিত্তাকর্ষক বোধ হত। তাই কলকাতার অধ্যাপক লাঁফো যে আকর্ষণ তাঁর চিত্তে প্রবিষ্ট করেছিলেন তা র‍্যালের আরও উন্নত শিক্ষায় গভীরতর হল। জগদীশচন্দ্র সহজেই বিজ্ঞানে কেমব্রিজের ট্রাইপস ডিগ্রী পেলেন এবং সেখানে আর পড়াশুনা না করেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে বি. এস-সি. পাশ করলেন (১৮৮৩)।

তখন পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী কালের গবেষণার লক্ষণ দেখা দেয়নি। কিন্তু যখন দেখা গেল তখন অধ্যাপক র‍্যালে ও ভাইন্‌স্ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে যথেষ্ট সমাদর করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের ছাত্রের এই মনস্বিতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য মুক্তকণ্ঠে জয় ঘোষণা করতেন এবং তাঁর নূতন নূতন আবিষ্কৃত সত্য ও তথ্যও বিদ্বৎ-সমাজে প্রচার করে গর্বিত হতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকতা

৪ বৎসর ইংলণ্ডে প্রবাসে থেকে তাঁর কেমব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় দুটি হতে দুটি উচ্চশ্রেণীর ডিগ্রী উপাধি অর্জন করা হল। তখন তাঁর বয়স প্রায় ২৫ বৎসর। দেশে তাঁর পিতার সংসারে তখন আয় বৃদ্ধি করা দরকার। সুতরাং জগদীশচন্দ্র একটি জীবিকার জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁর বড় বোন সরলপ্রভার স্বামী আনন্দমোহন বসু তখন কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার। শিক্ষা-প্রচারক রূপে এদেশে তাঁর খুব খ্যাতি ; ১৯০২ সালে তিনি মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। আনন্দমোহনের সঙ্গে তদানীন্তন পোস্টমাস্টার জেনারেল অধ্যাপক ফসেটের সখ্য ছিল। তাঁরা দুজনে বিলাতে সহপাঠী ছিলেন এবং অতি উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে

অধ্যাপক মহলে দুজনেরই বিশেষ সম্মান ছিল। পূর্ব সখ্য স্মরণ করে আনন্দমোহনের শ্যালককে এই সময় ফসেট ডেকে পাঠান। জগদীশচন্দ্রকে তখন জীবিকার অন্বেষক জেনে তাঁকে শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্তির জন্য ফসেট তাঁর সহকর্মী ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড কিম্বারলিকে পত্র দেন। কিন্তু তখন কোন চাকরির খবর তাঁর দপ্তরে ছিল না। সুতরাং দেশে গিয়ে খোঁজ নিতে তিনি পরামর্শ দিলেন এবং বড়লাট লর্ড রিপনকে এক সুপারিশ পত্র দিলেন।

লর্ড রিপনকে সিমলায় গিয়ে এই পত্র দিলে তিনি জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা-বিভাগে মনোনীত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শীঘ্রই বাংলা গভর্নমেণ্টের হাত দিয়ে বড়লাটের এই সুপারিশ কলকাতায় শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তিক্তস্বরে বললেন, 'নীচ থেকে লোকে আমাকে ধরে, উপর হতে নয়। এখন ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে কোন চাকরি নেই, প্রাদেশিক চাকরি নিতে পার, তা হতে পরে উন্নীত হতে পার।'

জগদীশচন্দ্র এই চাকরি নিলেন না। গেজেটে তাঁর নাম না দেখে, বড়লাট বাংলা গভর্নমেণ্টের কাছে বিলম্বের কৈফিয়ৎ চাইলেন। তখন ডিরেক্টর উত্যক্ত হয়ে এক অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিযুক্ত করে বললেন, 'কাজে যদি সফলতা দেখাও তখন স্থায়ী করা কিনা বিবেচনা করা হবে। এখন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের কাজ কর।' ভারতবাসী কল্পনার দাস, বিজ্ঞানে তাঁর কোন উৎকর্ষ সম্ভব নয়—এই ছিল তখনকার ইংরাজদের ধারণা। তাই কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ এতে আপত্তি জানালেন। 'কিন্তু একজন সদ্য বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাসের শৃঙ্খলা রক্ষা ও অধ্যাপনায় সক্ষম হবে না' কল্পনায়ই ডিরেক্টর তাঁকে নিযুক্ত (১৮৮৪ সনে) করেছিলেন।

অধ্যাপকতা সুরু করার পর জানা গেল যে ইম্পিরিয়াল চাকুরীতে ইউরোপীয়ের যা বেতন তার ⅔ অংশ দেওয়া হয় যদি সে অধ্যাপক ভারতবাসী হন। (কয়েক বৎসর পর জগদীশচন্দ্র এই বৈষম্য দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।) আর এই অস্থায়ী কার্য-কালে তাঁকে দেওয়া হত আরও অর্ধেক। জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন, তিনি অধ্যাপকতার কার্য অতি যত্ন সহকারে করবেন, কিন্তু বেতন তিনি স্পর্শ করবেন না। তিন বৎসর এমনি চলল; তাঁর পিতার ঋণজালে আবদ্ধ সংসার পুত্রের এই আয় উপেক্ষা করেই তাঁর সাহস ও ব্যক্তিত্বকে সমর্থন করেছিল।

অধ্যাপকতায় তাঁর খ্যাতি অচিরে প্রচারিত হল। তাঁর প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি ছাত্রদের এত চিত্তাকর্ষক হল যে ছাত্ররা কেউ অনুপস্থিত হত না, বরং অতি আগ্রহে পাঠ নিত। অধীত বিষয় ছাত্রদের অতি শীঘ্র আয়ত্ত হত। এমনি সহজ সরল ছিল তাঁর পড়াবার রীতি। তিন বৎসর পর অধ্যক্ষ টনি ও ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট তাঁকে একবারে গোড়া হতে স্থায়ী অধ্যাপক করে পূরা বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। এবং তদবধি তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বান্ধব হলেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝলেন, জগদীশচন্দ্রও বুঝলেন যে ইংরাজের সঙ্গে ব্যবহারের যোগ্য উপায় হচ্ছে রুখে দাঁড়ানো।

পিতৃঋণ শোধ

এই ভাবে তিন বৎসরের বেতন একযোগে পেয়ে তিনি তা তাঁর পিতার পাওনাদারদের দিয়ে দিলেন। আগেই তিনি পিতার এই ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন এবং রাড়িখালে গিয়ে নিজেই পৈতৃক সম্পত্তি ও বাড়ী-ঘর যা কিছু ছিল তা বিক্রী করে দেনা খানিকটা কমিয়েছিলেন। এভাবে পারিবারিক বাস্তুত্যাগ তাঁর পক্ষে

মর্মান্তিক হয়েছিল। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। এতেই ঋণভার অর্ধেক কমে গিয়েছিল। তখন তিনি মায়ের শরণাপন্ন হলেন। মায়ের গহনা ও নগদ টাকা তাঁর নিজস্ব। স্বামী বা তাঁর পাওনাদারদের তার উপর কোন দাবী নেই। তিনি বিলাত প্রবাসী ছেলের জন্যই তা হাতে রেখেছিলেন। সেই ছেলে আর সব দায় নিজ স্কন্ধে নিয়ে যখন দাঁড়ালেন তখন মা সব তাঁকে দিয়ে দিলেন। এমনি করে তিনভাগ দেনা শোধ হয়ে গেল। পাওনাদারেরা এতেই সব পাওনা শোধ হল মনে করে তৃপ্ত হলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁদের এরপরও কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে থাকলেন; এবং উপরোক্ত তিন বৎসরের বেতন দেবার পর আরও ৬ বৎসর কিস্তি চলে চলে সম্পূর্ণ ঋণ শোধ হয়ে গেল। ঋণশোধের পর ভগবানচন্দ্র আরও একবৎসর বেঁচেছিলেন। এবং জগদীশচন্দ্রের মা আরও দুই বৎসর। তাঁরা তাঁদের ছেলের পৃথিবী-জোড়া এত যশ ও সম্মান দেখে যান নি। কিন্তু পুত্র-পুত্রবধূর সংসারে তাঁরা ৭।৮ বৎসর সুখ-শান্তিতে বসবাস করে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন।

বিবাহ

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ, জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় বোনের পুত্র ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু জানিয়েছেন যে তাঁর যখন বয়স বছর দেড়েক—১৮৮৭, ফেব্রুয়ারী মাসে—জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগের বিখ্যাত দাশ বংশের দুর্গামোহন (ইনি ভগবানচন্দ্রেরও বান্ধব) স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে বাংলা দেশের আধুনিক অগ্রগতির অন্যতম নায়ক রূপে কীর্তিত। তাঁর দুই কন্যা সরলা ও অবলা এবং এক পুত্র সতীশরঞ্জন (S. R. Das)। সরলার স্বামী প্রসন্নকুমার রায় (P. K. Ray) পরিণত বয়সে

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং ব্যারিস্টার সতীশরঞ্জন বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন। অবলা তখন মাদ্রাজে মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। জগদীশচন্দ্রের সাথে তাঁর বিবাহ হল। জগদীশচন্দ্রও বিলাতে প্রথমে মেডিক্যাল ছাত্র ছিলেন এবং অবলাদেবীর বিজ্ঞানের জ্ঞান জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জীবনের ক্রমপরিণতির সূত্র বুঝে আনন্দিত ও গর্বিত হবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরিণামে এই বিবাহ অত্যন্ত সুখকর হয়েছিল। স্ত্রী স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন। Plant Autograph and their revelation পুস্তক (১৯২৭) জগদীশ-চন্দ্র উপহার দিয়েছিলেন, 'আমার পত্নীকে, যিনি আমার সকল যুদ্ধে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন।'

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন জানিয়েছেন যে দুর্গামোহনের অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহের পর ছয়মাস এই দম্পতি চন্দননগরে গঙ্গাতীরে একটি বাড়ী ভাড়া করে বাস করতেন। বাড়ীর ঘাটে তাঁরা একটি বোট কিনে বেঁধে রেখেছিলেন। অবসর মত তাঁরা নিজেরাই দাঁড় টেনে বেড়াতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার জন্য জগদীশচন্দ্র নদী পার হয়ে নৈহাটিতে ট্রেন ধরতেন, ফিরতেনও সেই পথে। স্ত্রীই নিজে দাঁড় টেনে বোটে করে স্বামীকে বিকালে এপারে নিতে আসতেন। কেমব্রিজে জগদীশচন্দ্রের দাঁড় টানার অভ্যাসটি এই-ভাবে এদেশেও অনেক দিন চলেছিল এবং পত্নীকেও এই অভ্যাসে দীক্ষিত করেছিলেন। গৃহস্থালীর ব্যাপারেও জগদীশচন্দ্র স্ত্রীর সহযোগী ছিলেন। তিনিই নাকি ভাঁড়ারের কৌটায় নিজহাতে লেবেল দিয়ে ও জমা খরচ রেখে অবলাদেবীর গৃহিণীত্বের সূচনা করেন। এইভাবে পরস্পরের অতি পরিচয়ের পর দুর্গামোহনের অভিপ্রায়েই তাঁরা কলকাতায় এসে ভগবানচন্দ্রের সঙ্গে থাকতে থাকেন। তখনও পিতৃঋণ সম্পূর্ণ শোধ হয় নি। অতি সংক্ষেপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হত। কিন্তু অবলাদেবীর মঙ্গল-হস্ত

ও সুব্যবস্থার গুণে সংসারে এক সুষ্ঠু পরিবেশ সর্বদাই বিরাজিত হত। এই স্নিগ্ধ আবেষ্টনে স্বামী শান্তিতে তাঁর জীবন-কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন। দু'জনের কর্মঠ ও সুব্যবস্থিত জীবন তাঁদের স্বভাবত সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবী করেছিল।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ

সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা ক্লাস নেবার পরও জগদীশচন্দ্র কলেজে আরও থেকে নানা পরীক্ষা করতেন। এই গভর্নমেণ্ট কলেজের কর্তৃপক্ষেরা এই কাজ সুনজরে দেখতেন না। এজন্য গবেষণার প্রয়োজনীয় জিনিযপত্রের ব্যয় তিনি নিজে বহন করতেন। এতেও শান্তি নেই। এই গবেষণার দিকে বেশী করে চিন্তা করে করে তিনি যে অধ্যাপনায় মনোযোগ দিতে পারছেন না, এ ক্রটিও প্রচারিত হল।

গবেষণার ফলে ১৮৯৪ সালে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টির নবতর যন্ত্র তৈরি করে তিনি একটি আলোড়ন আনলেন। ১৮৯৪, নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি পরীক্ষা হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হল, মধ্যের দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর নিজের শিক্ষক সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফাদার লাঁফো। ঘর ভেদ করে পাশের ঘরে একটি পিস্তল ছুঁড়ল সেই তরঙ্গ। ১৮৯৫ সনের প্রথম ভাগে লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার উলিয়ম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখালেন তাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দু'টি রুদ্ধ ঘর ভেদ করে ৭৫ ফিট দূরস্থ তৃতীয় ঘরে পৌঁছল এবং সেখানে একটি লোহার গোলা ছুঁড়ল, একটি পিস্তল আওয়াজ করল এবং একটি ছোট্ট বারুদের স্তূপ উড়িয়ে দিল। ৩০ শে নভেম্বর, ১৮৯৪ সনে, ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁর জন্মদিনে, গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার যে পণ তিনি গ্রহণ

করেছিলেন তাঁর সারাজীবনের কৃতকার্যতার প্রচারের প্রারম্ভ সেই দিনই সূচিত হল।

এই পরীক্ষা দেখে ছোটলাট খুব অভিভূত হয়েছিলেন। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় যখন এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হতে লাগল তখন এই উচ্চতর গবেষণার ফলস্বরূপ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি উপাধিতে ভূষিত করলেন, পরীক্ষা না নিয়েই। রয়াল সোসাইটি হতে তাঁর প্রবন্ধগুলি মুদ্রণের এবং তাদের পার্লামেণ্ট হতে পাওয়া বার্ষিক বৃত্তির কিয়দংশ তাঁকে দেওয়া স্থির হল।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন লাটসাহেব তাঁর জন্য শিক্ষা বিভাগে একটি বিশেষ পদের আয়োজন করেন। এতে বেতন বেশী থাকবে, তিনি স্বাধীন ভাবে গবেষণা করার সুযোগ ও অবসর পাবেন, বাংলা দেশের বিভিন্ন কলেজে বিজ্ঞান পড়া ও চর্চার জন্য উৎসাহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। নিম্নলিখিত কারণে এই পদ সৃষ্টিতে বিঘ্ন উপস্থিত হল। জগদীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। সেই সময় গভর্ণমেণ্টের উচ্চ-কর্মচারীদের অভিপ্রেত এক প্রস্তাবের বিপক্ষে তিনি ভোট দিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আর এক সভাতে উপস্থিত হতে পারলেন না। এই সভাতে কতিপয় উচ্চ গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীর সমর্থিত এক প্রস্তাব গৃহীত হবার কথা ছিল। অনুপস্থিতির জন্য জগদীশচন্দ্রের কৈফিয়ৎ তলব হল। তিনি জানালেন যদি কোন এক বিশেষ দিকে ভোট দেওয়াই তাঁর অবশ্য কর্তব্য মনে হয়ে থাকে তবে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সদস্য পদ পরিত্যাগের সম্মতি দিন।

ছোটলাটকে এই অবস্থা জানালে তিনি জগদীশচন্দ্রের তারিফ করলেন কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বৈরিতায় তাঁর জন্য উপরোক্ত নূতন পদ সৃষ্টি করতে পারলেন না। তিনি প্রস্তাব করলেন যে

জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণার জন্য কৃত খরচ দেওয়া হোক্। কিন্তু তিনি তা নিতে রাজী হলেন না। তখন গভর্ণমেণ্ট গবেষণার খরচ নির্বাহের জন্য বার্ষিক ২৫০০৲ মঞ্জুর করলেন।

নূতন পদ সৃষ্ট না হওয়ায় জগদীশচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন। এবং গবেষণার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার অভাব অনুভব করলেন। তিনি দার্জিলিঙ গিয়ে ছোট লাটসাহেবকে বললেন, ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের কর্মচারী হিসাবে তাঁর যে একবৎসর ফার্লো (সবেতন ছুটি) প্রাপ্য হয়েছে, তা তাঁকে এখন দেওয়া হোক্। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ইউরোপে গিয়ে সেখানকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে আসবেন এবং তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হবেন। লাটসাহেব জগদীশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি বললেন, এরূপ বিশেষ ব্যয়সাধ্য ইউরোপ ভ্রমণ করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে? সেই সুযোগে জগদীশচন্দ্র দাবী করে বসলেন যে তাঁকে গভর্ণমেণ্টের তরফ হতে বৈজ্ঞানিক বার্তা প্রচারের জন্য পাঠান হোক্। লাটসাহেব জানালেন যে শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রচারকার্যে বিদেশ গমনের সম্মতি ভারত গভর্ণমেণ্ট কখনও দেবেন না। তখন জগদীশচন্দ্র খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে করা তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সর্বত্র সাদরে গৃহীত ও আলোচিত হচ্ছে, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবোর্ড তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সম্প্রতি সিমলায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা বিজ্ঞান চর্চায় উদ্যোগী হয়নি। লাটসাহেব এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। জগদীশচন্দ্র ভগ্নমনোরথ হয়ে সেদিনই বিকালের ট্রেনে দার্জিলিঙ ছেড়ে রওনা হলেন।

দার্জিলিঙে ট্রেনে বসেছেন, তখন সেখানেই গভর্ণমেণ্টের বাহকের হাতে একখানি পত্র পেলেন। পত্র লিখেছেন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। ছোটলাট নিজ দায়িত্বে তাঁকে ছয়মাসের জন্য ইংলণ্ডে প্রচার কার্যে পাঠাচ্ছেন, তিনি নিজ সুবিধামত যে কোন দিন রওনা

হতে পারেন। লাটসাহেব তারযোগে এই বিষয় ভারত গভর্ণমেন্ট ও বিলাতে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস্‌কে জানাবেন। এই ভাবে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব গভর্ণমেণ্টের স্নেহ অর্জন করতে সমর্থ হল। এবং জগতে বসু-বিজ্ঞান প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পথ উন্মুক্ত হল (১৮৯৬)।

বিলাতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার পরীক্ষা ও প্রচার এত সমাদৃত হল যে নানা বৈজ্ঞানিক সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হতে লাগলেন। তা দেখে ইণ্ডিয়া আপিস সানন্দে তাঁর প্রচারকার্যের সময় আর তিনমাস বৃদ্ধি করে দিলেন। ১৮৯৭ সনে এপ্রিল মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

লর্ড কেলভিন তাঁকে লিখলেন (১ ৯৬), 'বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছি। কঠিন ও নূতন পরীক্ষার পথে এতখানি সফলতার জন্য আমার সংবর্ধনা গ্রহণ করুন।' ফরাসী সায়ান্স একাডেমীর ভূতপূর্ব সভাপতি মঁসিয়ে কর্ণু তাঁকে লিখেন (১৮৯৭), 'প্রথম পরীক্ষা-গুলিতেই প্রমাণ, আপনার হাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হবে। আমার কথা বলি, আপনার উন্নত ও ত্রুটি-হীন যন্ত্রের সাহায্য আমি নেব। এতে ইকোলো পলিটেকনিক ও আমার যা গবেষণা বাকী আছে তার সহায়তা হবে।' রবীন্দ্রনাথের ১৯শে জুলাই, ১৮৯৭ তারিখে লেখা বিখ্যাত প্রশস্তি কবিতা 'বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় ..' এই সময়ই মাতৃআশীর্বাদরূপে তাঁর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল।

গবেষণার প্রথম অধ্যায়
(১৮৯৪—১৮৯৭)

জগদীশচন্দ্রের এই অধ্যায়ের গবেষণা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে। যাঁরা বিজ্ঞানতত্ত্বে অনভ্যস্ত তাঁরা যাতে এই গবেষণার বিষয় কিছু কৌতূহলী হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে এই বিষয়ের কিছু

কিছু নিম্নে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম গবেষণা পর্যায়ের ফলস্বরূপ যে সব প্রবন্ধ পৃথিবীর নানা দেশীয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হয়ে নূতন সত্য আবিষ্কার হেতু বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন এনেছিল এই বইএর পরিশিষ্ট (ক)তে তার তালিকা প্রদত্ত হল।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের একটি পরীক্ষার বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। কলকাতা টাউন হলে বহুজন সমক্ষে এই পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়েছিল। এই সব পরীক্ষার আরম্ভ হল ম্যাক্সোয়েলের মতবাদ হতে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে আকাশের কোন অংশে একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিলে সেই অংশটা দুলতে থাকে এবং আকাশ যখন বিশ্বব্যাপী তখন এই দোলনও বিশ্বব্যাপী চলতে বাধ্য, তবে সে দোলন যত ছোট বা বড় হোক না কেন? আলোকের ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলতে পারে তবে এই তড়িতের টানে উৎপন্ন ঢেউগুলিরও ঠিক সেই লক্ষ ক্রোশ বেগেই চলার সম্ভাবনা।

ম্যাক্সোয়েলের মতের সমর্থন করলেন বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক হার্ৎজ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা। তড়িৎ চলে দুই রীতিতে—প্রবাহের মত, আর ঢেউএর মত। আলো, পাখা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, মটর প্রভৃতি চলে তাড়িত প্রবাহে। আর তড়িতের ঢেউ হল রেডিওর জনক। হার্ৎজ এমন যন্ত্র তৈরী করলেন যাতে একস্থানে তাড়িত তরঙ্গ সৃষ্টি করলে তা আকাশস্তর ভেদ করে কিয়ৎদূরে তার ক্রিয়া প্রকাশ করল। হার্ৎজ তড়িতের ও আলোর গতি সম্বন্ধে আরও অনেক কঠিনতর আবিষ্কার করলেন। কিন্তু অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হল। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার হার্ৎজের গবেষণার একটা উচ্চাঙ্গের পরিণতি। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র হার্ৎজের যন্ত্রের চাইতে অনেক ছোট কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রদর্শনে অধিকতর উপযোগী। তাঁর যন্ত্রে অতি দ্রুত বহু বহু ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি হল। তড়িৎ-তরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য তিনি আর একটি সুন্দর যন্ত্র এই সময় আবিষ্কার করেন।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত রয়াল সোসাইটির সভ্য টমশন প্রণীত 'দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে (২২৬-৭ পৃঃ) জগদীশ-চন্দ্রের এই বিখ্যাত আবিষ্কারের সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

তাছাড়া তড়িৎ-তরঙ্গের গতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য তিনি নানা দিক হতে পরীক্ষা করে করে বহু তথ্য নির্ণয় করলেন। কল্পনাবিলাসী বলে এতদিনের কুখ্যাত ভারতীয়দের মধ্য হতে উদ্ভূত এই অধ্যাপক অতি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষাদি দেখিয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক নানা বিজ্ঞান সমিতিতে আমন্ত্রিত ও সম্বর্ধিত হলেন। তাঁর আবিষ্কারে ঈথর তত্ত্ব (আকাশের দোলা) অগ্রসর হয়ে তারহীন টেলিগ্রাফির প্রারম্ভ সূচিত হল। তাঁর এই আবিষ্কার যে মৌলিক তার প্রমাণ বিখ্যাত নেচার পত্রে (১১ই জানুয়ারী, ১৯৩০) রয়াল সোসাইটির সদস্য ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কর্তা স্যার হেনরী জ্যাকসনের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 'টর্পেডো বোট বান্ধব জাহাজকে স্বীয় অগ্রগতির খবর কি করে দিতে পারে ১৮৯১ সালে নৌবাহিনী তা নিয়ে অনুসন্ধান সুরু করেছিল। স্যার হেনরী তখন সমুদ্রেই ছিলেন। হার্ৎজের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ব্যবহার সংবাদ প্রেরণে কার্যকরী হল না। ১৮৯৫ সনে ডাঃ বসুর (এখন স্যার জগদীশ) কোহিয়ারার বিষয়ক কতকগুলি পরীক্ষার বিষয় তিনি পড়লেন। তখন তিনি ডিফায়ান্স জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি কোন রকমে একটি সন্তোষজনক কোহিয়ারার সংগ্রহ করে সে বৎসরই তড়িৎ-চুম্বক-তরঙ্গ জাহাজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পাঠাতে সক্ষম হলেন। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ স্যার হেনরীর সঙ্গে মিঃ মারকনীর প্রথম দেখা হয়।' 'কোহিয়ারার' বিষয়ক পরীক্ষা ও তার ফল পরে আলোচিত হবে।

বিনা আয়োজনে, বিশেষ বাধা বিপত্তির মধ্যেও জগদীশচন্দ্র গবেষণা করেছেন। তাঁকে অনেকটা স্বাধীনতা ও উপযুক্ত আয়োজন দিলে তাঁর দ্বারা পদার্থবিজ্ঞানের দ্রুত অভিনব উন্নতি বিধান হবার

আশায় তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভূ লর্ড কেলভিন তদানীন্তন ভারত-সেক্রেটারী অব ষ্টেটস্‌কে লিখেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্রিটিশ সাম্রাজের যোগ্য কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার স্থাপিত হোক্। ঐ সঙ্গে এক আবেদনও তাঁর কাছে প্রেরিত হল। তাতে স্বাক্ষর করলেন রয়াল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিষ্টার, লর্ড কেলভিন, স্যার উলিয়ম র‍্যামজে ও ষ্টোকস, এবং রুকার, ক্লিক্‌টন, ফিজিরাল্ড, গ্ল্যাডষ্টোন, পয়নটিং প্রভৃতি অধ্যাপকগণ। এই সব আবেদনের প্রভাবে সেক্রেটারী ভারত গভর্নমেণ্টকে এই বিষয় বিবেচনা করতে লিখলেন (মে, ১৮৯৭)। তখনকার দিনের বড়লাট লর্ড এলগিন জগদীশচন্দ্রকে বললেন যে এ বিষয় তাঁর উৎসাহ আছে, তিনি বাংলা গভর্নমেণ্টকে লিখবেন। শেষে বিষয়টি শিক্ষা বিভাগে এল। তাঁরা জানালেন, বিষয়টি খুব গুরুতর, তবে এখনকার মত স্থগিত থাকুক।

জগদীশচন্দ্র বিলাতে তাঁর বন্ধুদের এ সব জানালেন না। পাছে এমন আন্দোলন হয় যাতে বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের রাজপুরুষরা তাঁর এমন শত্রু হয়ে পড়েন যে তাঁর গবেষণা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাজের এই বাধার কথা দেশের লোক তখন জেনে ফেলেছিল। এজন্য গভর্নমেণ্টের প্রতি বিরাগ ও তাঁর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা তখন বাঙ্গালা দেশের নেতৃস্থানীয়দের চিত্তে সঞ্চারিত হল। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর যোগ্যা সহধর্মিনীও তখন একটি স্বাধীন পরীক্ষাগার স্থাপনের কল্পনা করে নিজেদের সংসারের ব্যয় আরও সঙ্কুচিত করলেন।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮৯৮—১৯০২

পদার্থবিদ্যা হতে পদার্থের জীবনবিদ্যা

জগদীশচন্দ্রের এই সময়কার গবেষণা তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান হতে পদার্থের যে জীবন আছে তারি সন্ধানে নিয়ে যায়। কিন্তু সে কাহিনীর বৈজ্ঞানিক দিকটা যেমন তাঁর ভারতীয় প্রজ্ঞার পরিণতি, তেমনি তার প্রচারের দিকটা বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের চরম বিরুদ্ধতার দ্বারা কণ্টকিত। স্বরচিত অভিনব যন্ত্র সাহায্যে অতি সুন্দর চাক্ষুষ পরীক্ষার ফল তাঁর ধ্যানার্জিত স্বচ্ছ ভাষায় প্রচারের দ্বারা ধীরে ধীরে সর্বত্র স্বীকৃত হল। এইভাবে অসীম ধৈর্যে তাঁর ও তাঁর মাতৃভূমির জন্য জগতের বিজ্ঞান সভাগুলিতে মহাসম্মান প্রতিষ্ঠিত হল। নিম্নে এই মহাসাধনার বিবরণ একটু বিস্তৃত করে প্রদত্ত হল। পরিশিষ্ট (খ) তে এই সময়কার গবেষণা-প্রবন্ধগুলির নাম প্রদত্ত হচ্ছে। তা থেকে বিষয়গুলির ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে।

দেশে ফেরার ৬ মাস পরেই নভেম্বর (১৮৯৭) মাসে তিনি রয়াল সোসাইটিতে আবার গবেষণার ফল পাঠাতে থাকেন। এগুলি বৈজ্ঞানিকগণ সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু ৬ই মার্চ ১৮৯৯ তারিখের রয়াল সোসাইটির সভায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সেই সভায় জগদীশচন্দ্রের পূর্বতন অধ্যাপক লর্ড র‍্যালে প্রচার করলেন যে ডাঃ বসু প্রমাণ করেছেন যে বিভিন্ন ধাতুতে তার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করার ক্ষমতা কমে গিয়ে কিছু পরে আবার ফিরে আসে। 'On a self recovering coherer and the study of the cohering action of different metals'. তড়িৎ-তরঙ্গ বেতারে ধরার জন্য তখন পর্যন্ত ধাতুচূর্ণ বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহার করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে তড়িৎ-তরঙ্গ আকর্ষণ করে এই ধারকচূর্ণগুলি সমষ্টিবদ্ধ

হয়ে যায় অর্থাৎ কোহিয়ার করে; কিন্তু জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরেন যে আসলে ফল হয় উল্টো। এই পরীক্ষার ফল গৃহীত হলে আধুনিক রেডিওর প্রথম সংস্করণ ক্রিষ্টাল রিসিভার সেট তাঁর আবিষ্কার অনুসরণ করে তৈরী হল। কিন্তু ক্রিষ্টাল সেটেরও মাঝে মাঝে যে অবসাদ হয়, বিদ্যুত তরঙ্গ ধরতে বিলম্ব হয়, তা দেখে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

এই বিষয়ে চিন্তা অনুসরণ করে তিনি শীঘ্রই পরীক্ষা দ্বারা অবগত হলেন যে, জীবিত প্রাণীর যেমন অবসাদ আসে জড়ধাতু ও প্রস্তরেরও সেইরূপ অবসাদ এসে থাকে। এই জ্ঞান তাঁকে জড় ও জীবিতের মধ্যে ঐক্য সন্ধানে নিয়োজিত করে। উদ্ভিদের স্থান জড় ও জীবিতের মাঝামাঝি। অতঃপর তাঁর গবেষণা উদ্ভিদের প্রাণধর্ম, জীবন-স্পন্দন, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যুর তত্ত্ব নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হয়।

উপরে ৪ বৎসর ব্যাপী তাঁর গবেষণার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যে সব ঘটনা তাঁর গবেষণার সঙ্গে জড়িত তা এখানে প্রকাশ করা সঙ্গত। নানা উপকরণ হতে তথ্য উদ্ধার করে সংক্ষেপে তা দেবার চেষ্টা করব। "গত মঙ্গলবার…স্যার জে, উডবার্ণ (লেঃ গভর্ণর) আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratoryতে আসিয়া আমার Experiment (পরীক্ষা) দেখিবেন ও আমার ছাত্রদের কার্য দেখিবেন বলিয়া দিলেন।… Paris Congress এর নিমন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিলাম।… গত সপ্তাহে আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment আশাতীত রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্তেই ডাইরেক্টর হইতে পত্র পাইলাম, 'জানিলাম আপনি ছোট-লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন এবং প্যারিস প্রদর্শনীতে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় আপনি যোগ দিবার জন্য প্রেরিত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাকে

অনুরোধের হেতু কি জানাবেন,”। [রবীন্দ্রনাথকে লেখা ২রা মার্চ, ১৯০০ তারিখের চিঠি।] ৪ দিন পর আবার তাঁকে লিখেন, ‘স্যার জে. উডবার্ণ আমার Laboratoryতে আমার experiments দেখিতে আসিয়াছিলেন।…বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং… আমার ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য কতকগুলি Scholarship সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।…আমাদের Principal এসব দেখিয়া …আমার উপর একটু ভাল ভাব দেখাইয়াছেন।…আর Director লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ‘তুমি আমার চিঠি ভুল বুঝিয়াছ…তোমার সাথে আলাপ করিতে চাই।’ আজ গিয়াছিলাম। প্রথমে বড় stiff…প্যারিসে পরে গেলে হয় না—কে আপনার স্থলে কাজ করবে? কলেজের ক্ষতি হবে ইত্যাদি’ (কিয়দংশ তর্জমাকৃত)।

‘আমি সম্প্রতি একটি অত্যাশ্চর্য কৃত্রিম চক্ষু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই চক্ষে অনেক আলো দৃষ্ট হয় যাহা আমরা দেখিতে পাই না। তা ছাড়া ইহা রক্তিম ও নীল আলো অতি-পরিষ্কার রূপে দেখিতে পায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহা slightly green blind, আপনার চক্ষু কি করিয়া অনুকরণ করিল বুঝিতে পারি না।’

শেষোক্ত চিঠির দশ দিন পরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানান যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে প্যারিস প্রদর্শনীতে পাঠানর জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, ‘কিন্তু প্রভুদের তাদৃশ ইচ্ছা নাই।’ কিন্তু ছোট-লাটের তখনও ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। এর প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ২৯এ জুন, ১৯০০ তারিখে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেন, ‘সেক্রেটারী অব ষ্টেটের মঞ্জুর টেলিগ্রাম পাইয়াছি। আমাকে সত্বরই রওনা হইতে হইবে।…কখনও মহিয়সী মাতৃদেবীর অনুজ্ঞা শুনিতে পাই। তাঁহার ভৃত্য পদধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিবে। আপনারা আশীর্বাদ করুন, ভৃত্য যেন কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে পারে, তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি যেন বর্দ্ধিত হয়।’

প্যারিসের এই মহাপ্রদর্শনীর সময় পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'এই মহাকেন্দ্রের ভেরী ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন।—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ-সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষ স্থানীয় আজ—জগদীশচন্দ্র বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর।'

প্যারিসের সভা শেষ করে জশদীশচন্দ্র বসু ইংলণ্ডে চলে যান। সেখান হতে ৩১শে আগষ্ট, ১৯০০ রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র দেন তাতে প্যারিসের সভার ফল বিস্তৃত ভাবে আছে। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 'একদিন কংগ্রেস-সভাপতি হঠাৎ আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর কংগ্রেস সম্পাদক (তিনি ইংরাজী জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টির account চাহিলেন···তারপর আরও তিন দিন এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়···শেষ দিন আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কংগ্রেসের অন্যান্য সম্পাদক ও সভাপতির নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন···পরিশেষে আমাকে বলিলেন যে আপনার বিষয়টি প্রত্যেক অক্ষরে নূতন; এই theory প্রচার করতে অন্তত দু'বৎসর লাগিবে। ...এত surprise

একবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না—it is human nature. তারপর আরও বলিলেন, physicistsরা physiology জানেন না ; Vice Versa. তারপর আপনি যদি psychologyর সমাবেশ করেন, তাহা হইলে একেবারেই বুঝিতে পারিবে না। আর psychology, memory ইত্যাদি beyond physical Science, এসব আনিলে লোকে আপনাকে dreamy মনে করিবে। এজন্য প্রথমে purely physical বিষয় প্রকাশ করা উচিত।...

[সম্ভবত এই ব্যক্তি হইলেন অধ্যাপক পেট্রিক গেডেস। ইনি পরে ডাঃ বসুর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারে কয়েক বৎসর গবেষণা করেছিলেন এবং তাঁর অতি উৎকৃষ্ট জীবনী লিখেছিলেন (১৯২০)]।

এই গেল প্যারিসের পালা। তারপরে লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living, আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic, this is magic.'

দশ দিন পরে ব্র্যাডফোর্ডে ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের অভ্যর্থনা-গৃহ হতে লিখছেন, 'শুনিয়া সুখী হইবেন...আপনাদের প্রতিনিধি ...সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করিয়া আপনাদের আশা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল। আমার পূর্ব research সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক পত্রে অতি প্রশংসাবাদ এবং Prof. Lodge এর theory সম্বন্ধে অপ্রশংসা ছিল। Lodge ক্ষুণ্ণ ছিলেন।...১৫ মিমিটের অধিক সময় নাই, কেবল কয়জন expertকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছিলাম।...শেষ হইলে বহু প্রশংসাধ্বনি শুনিলাম। প্রেসিডেণ্ট বলিলেন...কাহারও কিছু প্রতিবাদ করিবার আছে

কিনা।..কিছুই নাই। তারপর Lodge উঠিয়া প্রশংসা করিলেন। ...আসিয়া আমাকে দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।...তারপর হঠাৎ দেখিলাম Lodge প্রেসিডেণ্টকে কি যেন বলিতেছেন। তখন প্রেসিডেণ্ট বলিলেন...পুনর্বার যদি তিনি (জগদীশচন্দ্র) কিছু বলেন তবে সুখী হইব। বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার stereoscope এ MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন।..হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি খুব ধনবান? এই সব যন্ত্র খুব ব্যয়-সাধ্য। আপনার কাজ অনেক বৎসর ধরিয়া চলিবে। সবই খুব মূল্যবান।'

তার পরদিন অধ্যাপক ব্যারেট আমাকে বলিলেন, 'কাল রাত্রে আমাদের কথা হইয়াছিল—আমাদের মধ্যে লজও ছিলেন—আমাদের ধারণা আপনার সময় ভারতবর্ষে নষ্ট হইতেছে—সেখানে আপনার কাজে বাধা আছে। আপনি ইংলণ্ডে আসুন না—এখানে উপযুক্ত অধ্যাপকের পদ মাঝে মাঝেই খালি হয়।—অধ্যাপকও পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে একটি ভাল পদ খালি আছে (কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন অধ্যাপক পদ) আপনি যদি নিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আর কেহই পাইবে না। এখন বলুন আমি কি করি! একদিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সে কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্য দিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ, সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র হতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—'ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই পাঠাইয়া

থাকি।……তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতদানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।……বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন! আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণমনে বিদায় দিতে হইবে। (অক্টোবর বা নভেম্বর, ১৯০০)

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—…আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি সকলে মিলে আমরা স্বাধীন করে দিতে পারিনে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুষিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্ (২০ নভেম্বর, ১৯০০)। গভর্নমেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনাবেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে সম্ভাবনা না থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য অসম্পন্ন করিয়া আসিও না। তুমি তোমার কার্যের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব। (১২ ডিসেম্বর, ১৯০০)

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হতে বিষয়টি আরও সহজ হবে। 'Chemists ও Physicists এর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম, Physiologistরাও সেইরূপ। সেদিন আমাদের Physical section-এ Chemistদিগকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।…Chemist প্রবর উঠিয়া বলিলেন, আপনাদের J. J. Thomson সেদিন বলিয়াছেন যে Atom অবিভাজ্য নহে, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র অনু আছে। যাহারা আমাদের atom এর উপর হাত তোলে তাহাদিগের সহিত আমাদের চিরসংগ্রাম। তারপর একজন Physiologist এর সঙ্গে দেখা হয়…তিনি বলিলেন, আমি দশ বৎসর হয় Curve সংগ্রহ করিতেছি।

…কেন উঠে, কেন নামে, কেহ জানে না, কেহ জানিবেও না। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, আমাকে কিরূপ সন্তর্পনে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইতেছে।…

লজ লিখিয়াছেন…ধীরে ধীরে তত্ত্বের উপর তত্ত্ব গঠন করুন এবং অতি উৎসাহ সংবরণ করুন। লর্ড র‍্যালে লিখিয়াছেন, বড় তাড়াতাড়ি হইতেছে, ধীরে ধীরে।…জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময় ও জানিতাম না কি অনন্তবিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। (৫ই অক্টোবর, ১৯০০)

তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম।…তোমাদের উৎসাহ-ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।…তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাহার অঞ্চলে আশ্রয় লই।… আমার সম্মুখে কত কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে বলিতে পারি না।…এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা কাজ করিতে পারিতাম।…তারপর প্রতি তিন বৎসর পর এক বৎসর ছুটি লইয়া এদেশে থাকিব। (২রা নভেম্বর, ১৯০০)

আমার সঙ্গে বিশেষ সংবাদ দাতা পাঠাইলে পারিতে ; অনেক কথা, লিখিবার সময় নাই।…Royal Institution হইতে Friday Evening Discourse দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আসিয়াছে। স্যার উইলিয়ম ক্রক্‌শ বিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে London এর full season সময় অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন…তখন আমার ছুটি ফুরাইয়া যাইবে।…ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছি। (২৩ নভেম্বর, ১৯০০)

আমি আর এক বৎসরের ছুটি চাহিয়াছিলাম ; তাহার পরিবর্তে ছয়মাস পাইয়াছি। সুতরাং…জার্মেণী ইত্যাদি স্থানে বক্তৃতা

করিবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না।...বিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী Messrs Muirhead & Co. আমার suggestions অবলম্বন করিয়া Wireless Telegraphy সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য ফল লাভ করিয়াছেন। ..Dr. Muirhead আমাকে নূতন আবিষ্কার-গুলি গোপন রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন...একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হই তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না।... আমাকে প্রতি তৃতীয় বৎসরে এদেশে আসিয়া আমার কার্য সম্বন্ধে প্রচার করিতে হইবে।...প্রেসিডেন্সি কলেজের সহিত সংশ্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাহিনা। কারণ, তাহা হইলে আমার কার্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না। (৩রা জানুয়ারী, ১৯০১)

আমি অনেক বিষয়ে পরিষ্কার দেখিতেছি। এখন সমস্ত বুঝিয়া আমাদের সমস্ত আচার-ব্যবহার ইত্যাদির উপর আমার শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইয়াছে। তবে আমাদের একটি বিশেষ অভাব...অতি সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি একতায় মহান হয়। (১৬ জানুয়ারী, ১৯০১)

১৯০০ সনের ডিসেম্বর মাস হতে জগদীশচন্দ্র ডেভি ফ্যারাডে ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর প্রাচীন শিক্ষক ও বান্ধব লর্ড র‍্যালে ও স্যার জেমস ডিউয়ার তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন। এই ল্যাবরেটরীতে তাঁর কাজে নানা দিক দিয়ে দ্রুত নব নব তথ্য উদ্ঘাটিত হতে থাকে। তিনি এ সম্বন্ধে লিখছেন, "আমি যে বিষয় British Associationএ বলিয়াছিলাম তাহা দুরূহ বৈদ্যুতিক নূতন বিষয়, সুতরাং Physiologistরা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।...কোন কোন Physiologist বলিয়াছিলেন যে আপনি Metallic Particles লইয়া Experiment করিতেছেন...কোন Solid metal এ চিমটি কাটিয়া তাহার অনুভূতি চিহ্ন দেখাইতে পারেন তাহা হইলে দ্বিধা থাকে না। আমি এক কল প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে এই চিমটি কাটিবার ফলে যে অনুভূতিরূপ স্পন্দন হয় তাহা automatically recorded হয়। সেই record আর আমাদের

শরীরে চিমটি কাটিলে যে record হয় (যাহার record physiologistরা পাইয়াছেন) তাহার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আর জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়ের ও জীবনীশক্তির স্পন্দন আমার কলে লিখিত হয়। তোমার নিকট এক অতি আশ্চর্য record পাঠাইতেছি। স্বাভাবিক নাড়ীর ক্রিয়া দেখিবে, তারপর বিষপ্রয়োগে নাড়ীর স্পন্দন হইতেছে দেখিবে। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ হইয়াছিল।

এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞান আহরণের জন্য ভারততীর্থে লোক সমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না।…আমরা কোন ফলের আশা করি না, তবু যেন আমাদের কার্য করিবার শক্তি নির্মূল না হয়। কোন দিনে কেহ রহিবে না, কিন্তু আমাদের আশার উচ্ছ্বাস যেন চিরজীবন্ত থাকে। (৩রা মে, ১৯০১)

'বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে physiology, physics এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব? আর experimentগুলি অতি কঠিন। কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল।…আমি বৃহস্পতিবার দিন দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়া ছিলাম… এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল; তোমাদের এত দিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্য নির্মূল হইবে একথা মনে করিয়া আমি কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য Unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী।…সেই অতি শীর্ণ অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল, 'বরণ করিতে আসিয়াছি।'…সেই মুহূর্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল।…কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না।…যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কে…আমার

মুখ দিয়া কথা বলাইল, জানি না; যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফুট হইল।

আমার বক্তৃতার কিয়ৎক্ষণ পূর্বে একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানির ক্রোড়পতি proprietor টেলিগ্রাফ করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে Patent form। বিশেষ অনুরোধ করিলেন,·· বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না··· আমি অর্ধেক লাভ নিব···ব্যবসায়ের মূলধন আমি দিব। এই ক্রোড়পতি আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ। আমি যদি এই যাঁতা-কলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই।···(১৭ মে, ১৯০১)

উপরোক্ত বক্তৃতা হয়েছিল ১০ই মে তারিখে রয়াল ইনষ্টিটিউসনে। এই সভায় জগদীশচন্দ্রের পরম বান্ধবী, ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপাসক ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সভার যে বিবরণ রবীন্দ্রনাথকে পাঠান তার রবীন্দ্রকৃত বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ডাঃ বসুর এইবার ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে নিবেদিতা মায়ের মত করে তাঁকে আগলাতেন। তাঁর আবিষ্কার চর্চায় উৎসাহ দিতেন, রয়াল সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতেন। তাঁকে ভারতীয় কৃষ্টি ও ধর্মের এতখানি প্রতিভূ মনে করতেন যে তাঁর কাছে ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যা বুঝে নিতেন।

'সন্ধ্যা ৯টা বাজিলে বসুজায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপক পত্নীকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং সাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল এবং সর্ব পশ্চাতে আচার্য বসু নিজে। তিনি শান্তনেত্রে একবার সমস্ত সভার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দে সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙ্গান রহিয়াছে। ···তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত। আপনি জানেন, আচার্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্য রচনা তাঁহার পক্ষে সহজ সাধ্য নহে···কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। ···মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল···এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রাসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সরল ভেদ নিরূপক সংজ্ঞা ছিল তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে;— অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষ-প্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধ প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্য-সংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে

অন্তর্হিত হইলেন—কেবল তাঁহার দেশ ও তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল…

এই সভায় জগদীশচন্দ্র উচ্চারিত শেষ কথা কয়টির কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করি—'আজ এই সন্ধ্যায় জীবিত ও জড়ের উপর চাপ ও তজ্জনিত অবসাদের আত্মচিত্র দেখালাম। এই চিত্রের রূপ এতখানি এক যে কোন্‌টি কার তা চিনবার উপায় নাই। …যখন আমি এই সর্ব বিশ্বব্যাপী এইরূপ একতা নীরবে প্রত্যক্ষ করি…তখন আমি ৩০ শতাব্দী পূর্বে গঙ্গাতীরে উচ্চারিত আমার পূর্বপুরুষগণের বাণীর যাথার্থ উপলব্ধি করেছিলাম। এই জগতের চির-পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে যাঁরা একটি অখণ্ড একতা দেখেন, সত্য কেবল তাঁদেরই আয়ত্তে, আর কারো নয়।'

বক্তৃতা শেষ হলে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হল। ধাতু সম্বন্ধে সব চাইতে বড় বৈজ্ঞানিক স্যার রবার্ট অষ্টেন বললেন, 'সারা জীবন ধাতু নিয়ে আমার চর্চা; তারা জীবিত, একথা ভাবতে আমার ভাল লাগছে…বলতে পারেন, এই জীবনের পরও কি আবার জীবন আছে?—আমার এই দেহের যখন মৃত্যু হবে তখন আমি কি হব?'

এর পরবর্তী বিবরণ আহরণ করে দিচ্ছি। "আরও অনেক আশ্চর্য বিষয় discover করিবার আছে। তারপর জার্মানীতে যাওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সেখান হইতে শুনিয়াছি, 'রক্ষণশীল ইংলণ্ড অপেক্ষা আমরা তোমার মত অনেক সত্বর মানিয়া নিতে প্রস্তুত।' তা ছাড়া ফ্রান্স ও আমেরিকায় তোমাদের যজ্ঞের অশ্ব পাঠাইবে না? (২২.৫.১৯০১ তারিখের পত্র)

তোমার স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়,…তোমাদের বলে আমি বলীয়ান।…তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি।…

আমি এ ছাড়াও অন্য তিনটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে paper লিখিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবে, Royal Society তাহা publish

করিবেন।…আমি দুই বৎসরের extension জন্য আবেদন করিয়া ছিলাম। Under-Secretary of State বলিলেন, পাইতে কোন কষ্ট হইবে না। তারপর জানিনা হঠাৎ কি হইয়াছে—হয়তো আমাদের আনন্দের কোলাহল অপ্রিয় হইয়া থাকিবে—হঠাৎ খবর পাইলাম… আমাকে সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (৬ই জুলাই, ১৯০১ এর পত্র)

দীর্ঘ রোগশয্যার…পর…একাগ্রভাবে এই ছয়মাস মাত্র সাধনার ফলে এখন আমার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া কি এক আলোক আসিয়াছে। দেখ, যদি সমস্ত বৎসরের চেষ্টার ফলে কেহ একটি paper Royal Societyতে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে কৃতার্থ মনে করে। আমি ছয় বৎসরের কাজ এই ছয়মাসে করিয়াছি। কিন্তু জীব ও নির্জীব জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে আমার সমস্ত জীবন দিতে হইবে।…জীবন সর্বস্বপণ করিতে হইবে…হিন্দুরা কোন দিন ফলের আশায় কাজ করে নাই। ইহাতেই তাহাদের নিস্ফলতা, ইহাতেই তাহাদের গৌরব।

এই পুস্তকখানা…ত্রিপুরার মহারাজাকে আমার হইয়া পাঠাইয়া দিবে। তাঁহার উৎসাহ বাক্যে আমি বিশেষ উৎসাহিত।…তোমরা আমার সমস্ত বোঝা লইয়া আমাকে একাগ্রভাবে কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছ, তবে আর দ্বিধা করি কেন? একথা যদিও সত্য বটে যে, politics এর জন্য Bhownagree জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৩০০০ পাউণ্ড প্রেরিত হয়, আর আমাদের পূজনীয় নারোজীকেও ভারতবর্ষীয়েরা স্মরণ করিয়াছেন এবং তাহার জীবন নিরুদ্বেগ করিয়াছেন। এবং তাতার University-র জন্য এদেশ হইতে ২৫০০৲ হইতে ১২০০৲ মাসিক বেতনে ইংরাজ অধ্যাপক মনোনীত হইবে। কিন্তু politics জন্য যেরূপ উৎসাহ, বিজ্ঞানের জন্য কি সেইরূপ উৎসাহ আছে? আর আমার জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশও অতি দীন ….”

আমি এখানে গভর্নমেণ্ট হইতে মাসিক ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ বার্ষিক

৮১০০৲ টাকা + বৃত্তি ২০০৲ + Researchএর জন্য ২৫০০৲ = ১২৬০০৲ টাকা পাই। আমার Assistant এবং কল ইত্যাদি বাবদ প্রায় ৪০০০৲ টাকা খরচ হয় আর বাকীতে আমাদের এখানকার খরচ অতি সাবধানে চালাইতে হয়। কারণ এখানে অনিবার্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত মেলামেশার জন্য কিছু অধিক খরচ হয়। (১১ জুলাই, ১৯০১ এর পত্র)

১৬ই জুলাই, ১৯০১ তারিখে লণ্ডন হতে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তের এক পত্র এই বিষয়টিকে স্পষ্টতর করছে। সেই দীর্ঘ ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের তাৎপর্য এই—'ডাঃ বসুর কাজের যদি সফলতা দেখতে চাও তবে কয়েকবৎসর লাগবে। ততদিন তাঁকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট তা করবে না এবং করতে পারে না...এই মুখোজ্জ্বলকারী কার্য হতে সরিয়ে নিতে পারলে তাদের দুঃখ হবেনা...আমাদের খ্যাতি ও সম্মানের জন্য যুদ্ধের এই প্রকৃষ্ট সময়..বৎসরে ১৫০০০৲ তাঁর অবশ্য দরকার, বাকী জীবনটা যাতে এই পরিমাণ টাকা তিনি পান তার জন্য জীবনবীমা আপিস কত নেয় ঠিক জানিনা।...কল্পনা করি, হয়তো লাখ দুই। এই টাকা সংগ্রহ করে যদি কোন জীবনবীমা আপিসে দিতে না পারি, তবে তাঁর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এবং সেই সাথে আমাদের দেশেরও।'

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ ও গবেষণার এই সঙ্কট কাল পাঠকের চিত্তে মানুষটির জীবন ও চরিত্রের একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে। আর তখনকার দিনের কতিপয় বাঙ্গালীর দেশের প্রতি মমতা ও তজ্জন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করে।

জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী গবেষণাদির বিবরণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি হতেই আরো উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 'গত দুই সপ্তাহে আরও কয়েকটি নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি। কি এক বন্যা আসিয়াছে, আমি তাহাতে ভাসিয়া যাইতেছি, আর নূতন নূতন দেশ দেখিতেছি।...আমি সম্মুখের মাসে একখানা পুস্তক লিখিবার চেষ্টা

করিতেছি, তাহা আমার মতের উপক্রমণিকা স্বরূপ হইবে। তারপর যদি কখনও আমার সমস্ত পরীক্ষা শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে একখানা বড় বই লিখিব, এরূপ ইচ্ছা করি। (২৫ জুলাই, ১৯০১)

আমার ডেপুটেসনের extension পাইলাম না ফার্লো'ই দিয়াছে। এ কয়মাস যাহা করিয়াছি এখন তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে। ইহাতে কয়দিন থাকিতে পারিব জানিনা। ··তোমরা যদি পার আমার মুক্তির সংবাদ শীঘ্র পাঠাইবে। ··আমাকে যদি নিশ্চিন্ত করিতে পার যে আমার কার্যের ব্যাঘাত হইবে না, তবে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১)

কতদিন হইল আমার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে জীবদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জ ও ধাতববস্তু সর্বত্রই একই অবস্থা (মর্মার্থ)। সেখানে একজন অতি বিখ্যাত Physiologist ছিলেন, Vegetable Physiology তাহার একচেটিয়া। তিনি বলিলেন, there can never be any electrical response in vegetables। তাহার উত্তরে আমি উদ্ভিদ রাজ্যের সাড়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি।···বেগুনে বিশেষ উত্তেজনা লক্ষিত হয়, (১৫ অক্টোবর, ১৯০১)

ঠিক এই সময়ই আগরতলা হতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক পত্রে লিখেন, 'আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশহাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।'

উপরে জগদীশচন্দ্রের প্রায় দেড় বৎসর ব্যাপী বিদেশে থাকাকালীন গবেষণা, বক্তৃতা প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটি বিশেষ খবর দেওয়া হয়নি। তা হচ্ছে ৬ই জুন, ১৯০১ তারিখে রয়াল সোসাইটিতে তাঁর দেওয়া একটি বক্তৃতার বিবরণ। এই

বিবরণ কেন জগদীশচন্দ্রের আগের চিঠিতেই ছিলনা তা তাঁর চিঠিতেই জানা যাচ্ছে, 'তোমরা চিন্তিত হইবে বলিয়া আমি এখানকার সব কথা খুলিয়া লিখি নাই। ইউরোপের···Sanderson এবং Waller এই দুইজন Physiologyর উচ্চসিংহাসন···অধিকার করিয়াছিলেন। আমি Royal Societyতে যে বক্তৃতা করি, তাহাতে দেখাই যে যদি নির্জীব ও জন্তুর responsiveness এর একই আধার হয় তাহা হইলে মধ্যবর্তী উদ্ভিদের response একই হবে। তাহাতে··· Sanderson বলিলেন, আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু সাধারণ উদ্ভিদের তড়িতে স্পন্দন অসম্ভব। আরও বলিলেন যে অধ্যাপক বসু ধাতুর physical ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য physiological terms প্রয়োগ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার প্রবন্ধ ছাপা (সম্ভবত Proof) হইয়াছে, তবু আশা করি তিনি মৃতবস্তুর বিষয় বর্ণনা করিতে physical termsই ব্যবহার করিবেন। (কিয়দংশ তর্জমাকৃত)

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; আর এই সব ক্রিয়া এক, সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুর প্রচারের বিরোধী। ফল হইল যে আমার Paper প্রকাশ বন্ধ হইল।···ইতিমধ্যে Linnean Society (Boiology সম্বন্ধে সর্বপ্রধান Society)র President Prof. Vines একদিন Prof. Hornes (successor of Huxley at the Royal College of Science)কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারিনা। তারপর Vines, as President of Linnean Society আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সমবেত Physiologist. Biologist—প্রমুখ বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী···১৫মিনিট মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম আমার জয় হইয়াছে। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কিনা? একেবারে নিরুত্তর।...এইমাত্র আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয় সংবাদে সুখী হইবে। মহারাজকে আমার এই সংবাদ জানাইও। তোমরা যদি আমার এখানে থাকিবার উপায় না করিতে তাহা হইলে নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। (২১ মার্চ, ১৯০২ এর চিঠি)

জগদীশচন্দ্র পরের মাসেই প্যারিস যাত্রা করেন। সেখানে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন—তিন স্থানে বক্তৃতা হয়। সর্বত্রই তাঁর মত গৃহীত হয়। জার্মানী হতেও নিমন্ত্রণ এসেছিল—কিন্তু দিন সাতেক পরে তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন। এর অল্প পরে বিলাতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে যেসব চক্রান্ত হয় তার সন্ধান তিনি পান। সে বিবরণ তাঁর কথাতেই পরিবেশিত হচ্ছে—'আমি কি কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তাহা জানাই নাই। Royal Society তে গত বৎসর মে মাসে Plant response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা Waller ও Sanderson চক্রান্ত করিয়া Publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নভেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর Paper ছাপা হইবার কথা যখন Council এ উঠে তখন Waller এর বন্ধুরা তথায় আমার Paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন।—এই বলিয়া যে Waller গত নভেম্বরে একথা Publish করিয়াছেন। Council এর কথা Confidential—সুতরাং এসব চক্রান্ত আমি জানিতাম না। আর Royal Societyর Paper বাহিরে প্রচার হয় নাই। সুতরাং প্রমাণাভাব বটে। ভাগ্যক্রমে আমার Royal Institution এর lectureএ একথা ছিল এবং দৈবক্রমে Linnean Societyর সেক্রেটারীর কাছে

আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি যে, আমার কাগজ ছাপা হইবে। President আমাকে লিখিয়াছেন, অনেক অদ্ভুত খবর পাইবেন, কিন্তু আমি খুসী হয়েছি আপনার প্রতি সুবিচার হইল' (কিয়দংশ তর্জমাকৃত)। (৮ই মে, ১৯০২)

এইরূপ বিরূপতার আঁধার শীঘ্রই তাঁর মন হতে মুছে গিয়েছিল—'তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্বত্রই জয় সংবাদ। তোমার নিকট তিনখানা পুস্তিকা পাঠাই। তারিখ দেখিলে বুঝিবে ইহা এক বৎসর পূর্বে পঠিত হয়, এক বৎসর পরে গৃহীত হইল। জড়ের স্পন্দন সম্বন্ধে গত বৎসরের ঘটনা জান—R. Society সত্বরই তাহা প্রকাশ করিবেন। Linn. Society উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আমার আবিষ্কার প্রকাশ করিবেন। ইতিমধ্যে Royal Photographic Society হইতে আহূত হইয়া Photography সম্বন্ধে আমার নূতন মত বিষয়ে বক্তৃতা করি, তাহাতে অনেকে নূতন তত্ত্বে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন।...আমি সম্প্রতি বিনা আলোকে ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছি। বন্ধু, আমি এবার নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া বিহ্বল হইয়াছি।' (২৭ জুন, ১৯০২)

কিছুদিন পরে Natureএ সম্পাদকীয় স্তম্ভে জগদীশচন্দ্র অভিনন্দিত হন। রয়াল সোসাইটি তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, British Association তাঁকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেন, Botanical Section এর সভাপতি তাঁকে বলেন যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বিবরণ দ্বারা তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের কলেবর বর্ধিত হবে।

দেশে ফিরে আসার জন্য তাঁর মন উদগ্রীব হয়েছিল। ইউরোপে তাঁর আবিষ্কার প্রচারিত ও স্বীকৃত হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন, ১১ই অক্টোবর, ১৯০২ তিনি কলকাতা পৌঁছবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ তাঁর চিরআকাঙ্ক্ষিত,—ডিসেম্বর মাসের কয়েকদিন তাঁর কাছে থেকে শরীর ও মন তিনি সঞ্জীবিত করে আনলেন।

পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র

১৯০৩—১৯১৬

পূর্ব অধ্যায়ে জগদীশচন্দ্রের সাধনার একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর প্রতিভা ও তার বিকাশের নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। আর আঁকা হয়েছে স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীর চেষ্টা ও বিদেশীর প্রতিরোধ। এই অধ্যায়টি কিছু দীর্ঘ। যাঁরা তাঁর জীবনের এই বিবরণ জানবেন তাঁদের নানা দিককার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয়তো বর্ধিত হবে সেই আশায় একে আর সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করিনি। যিনি যে কোন বিষয়ই গবেষণা করুন না কেন, জগদীশচন্দ্রের মত বিঘ্নের সম্মুখীন তাঁকে হতে হবে, ধরে নিলে তিনি দুঃখ কম পাবেন এবং এও তাঁর জানা রইল যে বাধা অতিক্রমের একমাত্র উপায় সেই বিষয়ের কাজে আরও এগিয়ে যাওয়া।

১৯০৩ হতে ১৯১৬ সন পর্যন্ত তাঁর জীবনের একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হচ্ছে। ১লা জানুয়ারী, ১৯০৩ সনে তিনি সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত হলেন। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তৃতীয় বার ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়েছিলেন যে ডাঃ বসুর আবিষ্কার স্বীকৃত হবে যদি তিনি স্বয়ং পরীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণিত করেন। তিনি প্রচার-কার্যে আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন। সর্বত্রই তাঁর জয় হয়েছিল। ১৯০৯ সনে তিনি দেশে ফিরে আসেন। পরীক্ষার ফল সর্বজন-প্রশংসিত ও গৃহীত হওয়াতে তাঁর প্রবন্ধগুলি ফিলসফিক্যাল ট্রান-জাকসনে প্রকাশিত হয় (১৯১০)। ১৯১১ সালে সম্রাটের করোনেশন উৎসব এদেশে হয়। তখন তিনি সি. এস. আই উপাধি পান। এ বৎসরেই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের (ময়মনসিংহ অধিবেশন) সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৩ সালে তাঁর অধ্যাপকতা হতে অবসর গ্রহণের কথা। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাঁর কার্যকাল আরও দুই

বৎসর বৃদ্ধি করলেন। জগতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে তাঁর নূতন আবিষ্কার প্রদর্শন ও প্রচার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট জগদীশচন্দ্রকে চতুর্থবার (১৯১৪) বিদেশে (রাশিয়া বাদ ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান) পাঠিয়ে দেন। পর বৎসর কার্য-কাল শেষ হলে গভর্ণমেণ্ট নির্দেশ দেন যে, তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যে বেতন পাচ্ছিলেন (১৫০০৲, মাসিক) সেই পূরা বেতনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কলেজের Emeritus Professor থাকবেন। ১৯১৬ সালে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়।

উপরোক্ত বিবরণ জগদীশচন্দ্রের জীবনের এই সময়ের একটি কাঠামো মাত্র, তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ আলেখ্য সৃষ্টি এতে হয় না। তা করতে হলে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের নব নব আবিষ্কার, সেই আবিষ্কার অনুসরণে তাঁর আশা ও বিঘ্ন, তাঁর ধ্যান ও জয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে হয়। স্বল্প আয়তনে তা সম্ভব নয়। এবং যাঁরা বিজ্ঞান পাঠে অনেকখানি অগ্রসর হন নি তাঁদের কাছে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বিস্তৃততর বর্ণনা অচল। রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশ-চন্দ্রের পত্রাবলী হতে উদ্ধার করলে পাঠকের সঙ্গে তাঁর গবেষণার কিছু কিছু যোগ স্থাপিত হবে কল্পনায় পূর্বের অধ্যায়ে সেই সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তবু এই সময় তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করেছেন পরিশিষ্ট (গ)তে তার তালিকা দেওয়া হল। তিনি যখন দেখলেন, বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলি তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশে অযথা বিলম্ব করছেন, পরে কেউ বা তা চুরি করে নিজ নামে প্রকাশ করছেন, তখন তিনি অশেষ পরিশ্রম করে দ্রুত কতকগুলি বই লিখে ফেলেন।

প্রবন্ধ ও বই লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণার কাজও চলেছিল। আর চলেছিল তাঁর বহু যত্নে সৃষ্টি করা সমস্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময় উৎপাদনকারী সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির আরও উন্নতি সাধন। ১৯০৭ সনে Comparative Electro-Physiology প্রকাশিত হবার পর

তিনি ৬।৭ বৎসর তাঁর যন্ত্রগুলির আরও উন্নতি সাধন করতে থাকেন, যাতে তাঁর গবেষণার ফল অতি সহজে পর্দায় ধরা পড়ে। তাঁর এই সব উন্নত ধরণের যন্ত্র সাহায্যে যে সব ফল পাওয়া গিয়েছিল তা সবই এই পুস্তকাবলীর চতুর্থ খণ্ডে—Researches on Irritability of Plantsএ বর্ণনা ও চিত্র সমেত সন্নিবেশিত হয়েছে।

উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা

জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণার কিছু আভাস দেওয়া হচ্ছে। সহজ-বোধ্য করার জন্য জটিল পরীক্ষাগুলি পরিত্যক্ত হল।

(ক) লজ্জাবতী লতার গাছের একটি ডালের একটি পাতা ছুঁয়ে দিলে সে ডালের সব কটি পাতা ধীরে ধীরে বুঁজে যাবে। এইরূপ অনুভূতি ক্ষমতা অন্য গাছেরও অল্প বা বেশী আছে কিনা পরীক্ষার জন্য তিনি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সেই যন্ত্র সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন, সব উদ্ভিদেরই অনুভূতি আছে মানুষেরই মত।

(খ) ঔষধ দিয়ে তিনি দেখালেন, গাছও মানুষের মত বিষে মরে, সে বিষ নষ্ট করলে তাজা হয়ে ওঠে; মাদক খেয়ে মাতালের মত দোলে, তা মুছে দিলে প্রকৃতিস্থ হয়।

(গ) উদ্ভিদ জল খায়, জল না পেলে মাটির রস টানতে পারে না, এবং তাই-ই তাঁর আহার, এই ধারণা সকলেরই আছে। কিন্তু গাছের সব খাদ্যই কি শিকড়-টানা রস? ২৫০।৩০০ হাত উঁচু গাছও তো আমেরিকাতে আছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে গাছের খাওয়ার জন্য শিকড় অপরিহার্য নয়। একটা চারাগাছের শিকড়-সহ কাণ্ডের খানিকটা কেটে ফেললে গাছটি মুসড়ে পড়বে। কিন্তু সেই কাটা-গাছকে জলের পাত্রে বসালে খানিক পরে তাজা হয়ে উঠবে (এই পরীক্ষায় দোপাটি, কসমস, ডালিয়া প্রভৃতি মাংসল গাছ উত্তম)। সুতরাং শিকড়ই রস টানার একমাত্র পথ নয়। বরং আরও পরীক্ষায় দেখা

গেছে যে দুটি অর্ধশুষ্ক দোপাটি গাছের যেটিতে শিকড় কাটা হয়েছে, জলে রাখলে সেটিই তুলনায় বেশী তাড়াতাড়ি তাজা হয়ে ওঠে।

(ঘ) আর এক পরীক্ষায়, দেখা গেল, শিকড়-তোলা গাছ মুসড়ে পড়ার পর যদি শিকড় উপরে ও গাছের ডগা তলায় করে, ডালের আগা জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তবে গাছ তাজা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ গাছের ডালপালাও রস টানে।

এই সব পরীক্ষার ফলে জগদীশচন্দ্র বলেন যে বৃক্ষকোষগুলি ক্রমাগত আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণের ফলে গাছ মাটি অথবা অন্য কোন পাত্র হতে জল টেনে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেয়। সব জীবিত প্রাণীরই এই রীতি। সব প্রাণীরই হৃদয়ের সংকোচন-প্রসারণের ফলে সারা দেহে রক্ত চলাচল করে।

উপরের পরীক্ষায় রসটানাকাজে শিকড়ের কতখানি দরকার তার আলোচনা আছে। কিন্তু তাই বলে শিকড় পরিত্যাজ্য নয়। শিকড় গাছকে মাটির সাথে আটকে রাখে, অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে অনেক দূরের রস আহরণ করতে পারে এবং শিকড়ের দেহের গঠন এমন যে, যে-রস গাছ টেনে নিয়েছে তা শিকড়ের পথে মাটি আর শুষে নিতে পারে না।

(ঙ) গাছের আর এক বৈচিত্র হল তার আলোক-তৃষ্ণা। সূর্যমুখী ফুল সারাদিন সূর্য প্রদক্ষিণের সাথে নিজের মুখ এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। সব গাছের উপরের অংশেরই এই প্রকৃতি,— কারও বেশী কারও কম—তাও পরীক্ষায় জানা গেল। অনেক গাছের পাতা রাত্রে বুজে থাকে, দিনের আলোতে মেলে। যদি চারদিক ঢাকা একটা বড় বাক্সের মধ্যে একটা গাছের টব রাখা যায় এবং বাক্সের এক দিকে একটা জানালা কাটা হয় তবে টবের গাছের ডালগুলি আলোর লোভে জানালার দিকে হেলে আসবে। যদি টব ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তবে গাছটি আবার আলোর দিকেই উল্টো বেঁকে আসবে।

(চ) আলোর অভাব হয় বলেই বড় গাছের নীচে ছোট গাছ বাঁচে না। যেখানে সারাদিনই ছায়া সেখানে বাগানের গাছ নির্জীব হয়ে থাকে। বেশী গরম সইতে পারে না, এমন গাছ অনেক আছে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাঁচতে হলে একটু শীতল স্থানে তাদের রাখতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু আলো তাদেরও চাই। মাঠের ঘাসের উপর একটা ইট বা তক্তা ফেলে রাখলে দু'দিন পরেই দেখা যাবে, নীচের ঘাস বিবর্ণ ও মৃতপ্রায় হয়েছে। দুদিন খুলে রাখলেই আবার তাজা হয়। তবে ত এই আলো গাছের জীবনের পক্ষেও প্রয়োজন। গাছ কি আলো খায় ?

(ছ) কার্বণ বা অঙ্গার গাছের সর্বপ্রধান খাদ্য। কার্বণ-ডাই-অক্সাইড (অঙ্গারক জান) নামক গ্যাস হতে গাছেরা তা সংগ্রহ করে অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। ঐ গ্যাস ভাঙার কাজে গাছের চাই আলো, গাছের সবুজ রং এবং জল। জল ও ঐ সবুজ রং অল্প বিস্তর সর্বদাই গাছের দেহে বিদ্যমান ; সুতরাং আলোই প্রধানতম প্রয়োজনীয় বস্তু যা ছাড়া গাছের আহার বন্ধ। তাই গাছেরা দিনে খায়, রাত্রে ঘুমায়।

(জ) জলজ গাছ খাদ্য পায় জলেগোলা কার্বন-ডাইঅক্সাইড হতে। সেখানে কার্বণ খেয়ে অক্সিজেন ছাড়ার প্রমাণ জলের ঝাঝি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল—বুদ বুদ করে যে গ্যাস উঠল তা মানুষের নিঃশ্বাসের জন্য প্রতিমুহূর্তের প্রয়োজনীয় অম্লজান (অক্সিজেন)। প্রসঙ্গত বলা যায় যে মানুষের প্রশ্বাসের সঙ্গে অনবরত কার্বণ-ডাই অক্সাইড নির্গত হয়ে বাতাস দূষিত হচ্ছে। আবার সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আকাশস্থ এই কার্বণ-ডাইঅক্সাইড উপরোক্ত ভাবে উদ্ভিদ-জীবন-দ্বারা শোধিত হয়ে মানুষের নিঃশ্বাস নিয়ে জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন উদগীর্ণ হচ্ছে। এ ছাড়া, বহু উদ্ভিদ আহার্য, ওষধি এবং শোভা ও সুগন্ধির আধাররূপে আমাদের জীবনের পরিপোষক হয়ে আছে।

(ঝ) গাছেরও স্নায়ু আছে। পাতা, ডাল বা কাণ্ডের দ্বারা বড় বা ছোট আঘাত গাছের স্নায়ুতে পৌঁছে। আগে বরফ দিয়ে সে স্থান অসাড় করে নিয়ে আঘাত করলে ব্যথা কম পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র স্ব-আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে গাছের এই স্নায়ুর পীড়া ও মুক্তি দেখিয়ে ছিলেন। এই পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল যে অনুভূতি প্রবাহিত হয় ডালের গ্রন্থি ও পাতা বা ফলের বোঁটার পথে। এই উত্তেজনার নিবৃত্তি হয়ে স্নায়ু স্বাভাবিক হতে প্রায় পনর-কুড়ি মিনিট লাগে।

(ঞ) সমস্ত বৃক্ষশরীর কতকগুলি কোষের সমষ্টি, একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আচার্য বসু অতঃপর যন্ত্রসাহায্যে প্রমাণ করেন যে এই আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণশীল কোষগুলিই অন্যান্য জীবের হৃদ্‌পিণ্ডের ন্যায় স্পন্দন করে এবং স্ব-স্ব জীবন ধারণে একই ফল প্রদান করে। তাঁর আবিষ্কৃত স্পন্দন লিপি যন্ত্রে (স্ফিগমোগ্রাফ) গাছের কোষের এই প্রতি-নিয়ত সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন আঁকা হয়ে যায়, এমন ব্যবস্থা আছে। উদ্ভিদ বিষয়ক তাঁর গবেষণার জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির তালিকা পরিশিষ্ট (চ)তে প্রদত্ত হল।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব হতে এবং পরে সারা জীবন উদ্ভিদের জীবনতত্ত্বই তাঁর আবিষ্কারের বিষয় ছিল এবং তিনি অবিসংবাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে মানুষের দেহ ও মনের মতই উদ্ভিদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কথা পৃথক অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক মাত্র ছিলেন না। তাঁর সাহিত্যসাধনা, দেশপ্রেম ও শিল্পানুরাগ তাঁকে নানা কার্যে উদ্বোধিত করেছিল। তাঁর সাহিত্য সাধনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে।

সাহিত্য পরিষদ-সভাপতি জগদীশচন্দ্র

এই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকের চিত্তের মধ্যে ছিল কাব্য-সরস্বতীর বসতি। তাই একাধারে যেমন তাঁর বিজ্ঞান একটা অনুভূতিশীল জড়জগতে নিয়ে যেত তেমনি শিল্প ও কল্পনার রাজ্যেও তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় দশ বৎসর অধ্যাপকতা করার পর, যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্যে তিনি নিতান্তই ব্যাপৃত, তখন 'দাসী' পত্রে (প্রবাসীর প্রাক্তন) তাঁর 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' মুদ্রিত হয় (১৮৯৪)। সেই একটি রচনাতেই অতবড় ইংরাজী শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক মধ্যে একজন উঁচুদরের বাঙ্গালা সাহিত্যিকের আবির্ভাব সূচিত হল। সেই বৎসরেই তাঁর 'যুক্তকর', 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' ও 'গাছের কথা' লিখিত হয়। পরবৎসর লিখিত হয় 'অগ্নিপরীক্ষা'। এই প্রবন্ধগুলিতে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-তথ্য ও মননশীলতা পরিবেশিত হয়েছে তা জগদীশচন্দ্রের চিন্তা ও লেখনীর গুণে সহজবোধ্য হয়েছে। এই ভাবে জ্ঞান ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছিল তারই ফলস্বরূপ তিনি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১৯১১খৃঃ—১৩১৮, ১-৩ বৈশাখ] এই সম্মিলনে তাঁর প্রদত্ত অভিভাষণ 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধরূপে তাঁর অব্যক্তে উদ্ধৃত হয়েছে।

গবেষণার ফল প্রচারের জন্য চতুর্থবার (১৯১৪) গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বিদেশে পাঠান। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হতে তিনি জয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসেন পরবৎসর। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস-সি উপাধি দেন। ১৩২২, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে এক সান্ধ্য সম্মিলনে সম্বর্ধিত করেন।

১৩২৩ সালের পরিষদ-সভাপতি নিযুক্তির কালে দেখা গেল যে প্রাচীন ও নবীন দলে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হয়ে দেখলেন যে দুই দলই জগদীশচন্দ্রের নাম প্রস্তাব

করলেন। ১৩২৫ সাল অবধি তিনি পরিষদ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই সময় দলাদলি অপসৃত হয়ে নানা কর্মের প্রকাশ ঘটেছিল।

তিনি ১৩২৪ সাল হতে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতামালার বিশেষ আয়োজন করেন এবং সে বৎসরই আলোকচিত্র সহযোগে নিজে ৭ই চৈত্র তারিখে 'আহত উদ্ভিদ' বিষয় বক্তৃতা করেন। যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুণীলাল বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মন্মথমোহন বসু, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্ব স্ব বিষয়ে বিভিন্ন দিনে এই আমলে বক্তৃতা করেন। জগদীশচন্দ্র এখানে আর একটি বক্তৃতা দেন, 'স্নায়ু-সূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ' (ছায়াচিত্র যোগে-১৯ চৈত্র, ১৩২৭)। এইটি এবং পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ (১৯১৮) প্রদান করেন তা 'প্রাচীন ও নবীন' নামে 'অব্যক্তে'ই উদ্ধৃত হয়েছে। 'পলাতক তুফান' শীর্ষক তাঁর একটি রহস্য-রচনাও উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ সনে তিনি পঞ্চমবার বিদেশে প্রেরিত হন। পরবৎসর তিনি জয়মাল্য নিয়ে ফিরে এলে ১৩২৭ সন, মাঘ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে সোনার দোয়াত কলম দিয়ে সম্বর্ধনা করেন। ১৩৩৪, ১৫ই অগ্রহায়ণ সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পরিষদ্ তাঁকে সম্বর্ধনা সভায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

জগদীশচন্দ্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিনী বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উন্নতিকল্পে ৩০০০৲ টাকা দিয়ে পরিষদে এক স্মৃতি তহবিল গঠন করেছেন। জ্ঞানী ও সাহিত্যিক এই মনীষীর জীবনের সঙ্গে এমনি করে সংশ্লিষ্ট হয়ে পরিষদ্ গৌরবান্বিত হয়েছে।

১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে 'উদ্ভিদের প্রাণ-যন্ত্র' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। এই কঠিন বিষয়টি বাংলা ভাষায় কত সহজ করে তাঁর প্রতিভার প্রভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা পড়লে বিস্ময় বোধ হয়।

জগদীশচন্দ্রের ইংরাজী ও বাংলা রচনার নিদর্শন

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন। আগে এক অধ্যায়ে তাঁর চিঠি পত্র হতে তাঁর মনের অনেক কথা তাঁরই ভাষাতে ধরে দেওয়া হয়েছে। সেইখানে যেমন আবিষ্কার সম্পর্কে দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে তেমনি স্বচ্ছ ভাষায় তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে আবিষ্কারগুলির তাৎপর্য বোধগম্য হয়েছিল, যদিও তিনি রীতিমত বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। এবং বোধগম্য হয়েছিল বলেই তিনি স্বয়ং এই বিষয় কতক প্রবন্ধ বাংলায় লিখে বাঙালীকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত করতে পেরেছিলেন। এখানেই জগদীশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য। জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেম সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে তাঁর লেখা হতে যে উদ্ধৃতি থাকবে সেখানে তাঁর রচনার আরও নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখানে যা উদ্ধৃত হচ্ছে তা হতে তাঁর জীবনের ছবিও পরিস্ফুট হবে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সময়ের অভিভাষণ হতে—'The work already carried out in my laboratory on the response of matter, and the unexpected revelations in plant life, foreshadowing the wonders of the highest animal life, have opened out very extended regions of inquiry in Physics, in Physiology, in Medcine, in Agriculture and even in Psychology. Problems, hitherto regarded as insoluble, have now been brought within the sphere of experimental investigation. These inquiries are obviously more extensive than those customery either among physicists, physiologists, since demanding, interests and aptitudes hitherto more or less divided between them. In the

করলেন। ১৩২৫ সাল অবধি তিনি পরিষদ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই সময় দলাদলি অপসৃত হয়ে নানা কর্মের প্রকাশ ঘটেছিল।

তিনি ১৩২৪ সাল হতে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতামালার বিশেষ আয়োজন করেন এবং সে বৎসরই আলোকচিত্র সহযোগে নিজে ৭ই চৈত্র তারিখে 'আহত উদ্ভিদ' বিষয় বক্তৃতা করেন। যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুণীলাল বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মন্মথমোহন বসু, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্ব স্ব বিষয়ে বিভিন্ন দিনে এই আমলে বক্তৃতা করেন। জগদীশচন্দ্র এখানে আর একটি বক্তৃতা দেন, 'স্নায়ু-সূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ' (ছায়াচিত্র যোগে- ১৯ চৈত্র, ১৩২৭)। এইটি এবং পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ (১৯১৮) প্রদান করেন তা 'প্রাচীন ও নবীন' নামে 'অব্যক্তে'ই উদ্ধৃত হয়েছে। 'পলাতক তুফান' শীর্ষক তাঁর একটি রহস্য-রচনাও উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ সনে তিনি পঞ্চমবার বিদেশে প্রেরিত হন। পরবৎসর তিনি জয়মাল্য নিয়ে ফিরে এলে ১৩২৭ সন, মাঘ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁকে সোনার দোয়াত কলম দিয়ে সম্বর্ধনা করেন। ১৩৩৪, ১৫ই অগ্রহায়ণ সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পরিষদ্ তাঁকে সম্বর্ধনা সভায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

জগদীশচন্দ্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিনী বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উন্নতিকল্পে ৩০০০৲ টাকা দিয়ে পরিষদে এক স্মৃতি তহবিল গঠন করেছেন। জ্ঞানী ও সাহিত্যিক এই মনীষীর জীবনের সঙ্গে এমনি করে সংশ্লিষ্ট হয়ে পরিষদ্ গৌরবান্বিত হয়েছে।

১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে 'উদ্ভিদের প্রাণ-যন্ত্র' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। এই কঠিন বিষয়টি বাংলা ভাষায় কত সহজ করে তাঁর প্রতিভার প্রভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা পড়লে বিস্ময় বোধ হয়।

জগদীশচন্দ্রের ইংরাজী ও বাংলা রচনার নিদর্শন

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন। আগে এক অধ্যায়ে তাঁর চিঠি পত্র হতে তাঁর মনের অনেক কথা তাঁরই ভাষাতে ধরে দেওয়া হয়েছে। সেইখানে যেমন আবিষ্কার সম্পর্কে দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে তেমনি স্বচ্ছ ভাষায় তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে আবিষ্কারগুলির তাৎপর্য বোধগম্য হয়েছিল, যদিও তিনি রীতিমত বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। এবং বোধগম্য হয়েছিল বলেই তিনি স্বয়ং এই বিষয় কতক প্রবন্ধ বাংলায় লিখে বাঙালীকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত করতে পেরেছিলেন। এখানেই জগদীশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য। জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেম সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে তাঁর লেখা হতে যে উদ্ধৃতি থাকবে সেখানে তাঁর রচনার আরও নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখানে যা উদ্ধৃত হচ্ছে তা হতে তাঁর জীবনের ছবিও পরিস্ফুট হবে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সময়ের অভিভাষণ হতে—'The work already carried out in my laboratory on the response of matter, and the unexpected revelations in plant life, foreshadowing the wonders of the highest animal life, have opened out very extended regions of inquiry in Physics, in Physiology, in Med-cine, in Agriculture and even in Psychology. Prob-lems, hitherto regarded as insoluble, have now been brought within the sphere of experimental investiga-tion. These inquiries are obviously more extensive than those customery either among physicists, physio-logists, since demanding, interests and aptitudes hitherto more or less divided between them. In the

study of nature, there is a necessity of the dual view-point, this alternating yet rhythmically unified interaction of biological thought with physical studies, and physical thought with biological studies. The future worker with his freshened grasp of physics, his fuller conception of the inorganic world, as indeed thrilling with the promise and potency of life will redouble his former energies of work and thought. Thus he will be in a position to winnow the old knowledge with finer sieves, to research it with new enthusiasm and subtler instruments. And thus with thought and toil and time he may hope to bring fresher views into the old problem. His handling of these will be at once more vital and more kinetic, more comprehensive and unified.'

'অব্যক্তে' এই প্রতিষ্ঠা দিবসের যে অভিভাষণ বাংলা ভাষায় 'নিবেদন' রূপে মুদ্রিত হয়েছে তা হতে ভিন্ন প্রসঙ্গে—"বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা, কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে

অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষা প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না, পর্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আনবিক কারুকার্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-উর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষ-জীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই বৃদ্ধি মাত্রার পরিবর্তন মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্য স্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়-স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদের স্নায়ুর আবেগ উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান

আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে-সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সংগমেই সেই মহাতীর্থ '

রবীন্দ্রনাথের সাধনার বান্ধব জগদীশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগের কথা ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। এখানে সেই প্রসঙ্গের সূত্রানুসরণ করছি।

১৮৯৬ সনে বিদেশে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার ফল প্রচার করে বিস্তীর্ণ যশের অধিকারী হন। পৃথিবীর বিখ্যাত বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর তখনকার এই পদার্থবিদ্যার আবিষ্কারগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। দেশে ফিরে এলে (এপ্রিল, ১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে যান ; বাড়িতে না পেয়ে টেবিলের উপর মস্ত বড় একটা ম্যাগনোলিয়া ফুল রেখে আসেন। সেই হতে এই দুই পুরুষোত্তমের মধ্যে যে বান্ধবতা গড়ে ওঠে তা দুইজনের জীবনের ব্যাপ্তির পরিপোষক হয়েছিল

যে উৎস হতে এই দুই মনীষী জগতে তাঁদের বাণীপ্রচারের বিষয়-বস্তু পেয়েছিলেন তা তাঁদের স্বদেশের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার। রবীন্দ্র-নাথ জগদীশচন্দ্রের সাধনার কিরূপ বান্ধব ছিলেন সে বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। জগদীশচন্দ্রও যে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য বান্ধব ছিলেন সে বিবরণ এখানে প্রদত্ত হচ্ছে।

এই দুই বন্ধুর মিলনের সময় জগদীশচন্দ্রের বয়স ছিল ৩৮। রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ৩৪। স্বদেশে বা বিদেশে যিনি যখন

যেখানেই থাকুন না কেন, দুজনেরই যোগাযোগ—হয় একসঙ্গে যাপনে নতুবা পত্র বিনিময়ে—সারাজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল, 508 W. High Steet, Urbania, Illinois, U. S. A. Dec. 1912/ Jan. 1913 এর রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে পাওয়া যায়—'বন্ধু, আমি অনেকদিন হতে তোমার পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পরিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটি মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াসা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোন ফল নাই, কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাস বাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।'

ইহার অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। তখন জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেন—'বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যে ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সে দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চিরসহায় হউন।' এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রের নেতৃত্বেই একদল রবীন্দ্রভক্ত (নভেম্বর, ১৯১৩) স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সম্বর্ধনা করেন।

এ বিবরণ পরিণত বয়সের কথা। কেমন করে এই দুজন পরস্পরের নিকটতর ও কর্মের সহায়ক হলেন তা এদের চিঠিপত্রে দীপ্যমান হয়ে আছে। ১৮৯৯, ২৬শে মের চিঠির 'প্রিয়বরেষু' ও আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরবৎসর ১৭ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে 'প্রিয়বন্ধু' ও আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়েছে। তারপর

১২ই ডিসেম্বর হয়েছে 'বন্ধু' ও তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ। এবং পরের মাসেই হয়েছে 'বন্ধু' ও তোমার 'রবি'। এত দ্রুত নৈকট্যের কারণ পরস্পরের গুণমুগ্ধতা। অথচ একজন কবি, আর একজন বৈজ্ঞানিক। একজনের চিত্ত নিরন্তর কল্পনায় রঙ্গীন এবং আর একজনের মন চাক্ষুষ পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় আবিষ্কারের স্থিতিমূল দৃঢ় করবার জন্য উদ্যোগী। কিন্তু আশ্চর্য এই যে দু'জনেই কবি ও বৈজ্ঞানিক চিত্ত নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুর জীবনের সহায়ক হয়েছিলেন।

২০ শে মে ১৮৯৯, ৭ জৈষ্ঠ, ১৩০৬ জগদীশচন্দ্র লিখেন, 'আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন?...মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন। ...একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেব-চরিত্রে আমরা অভিভূত হই। কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের একটা সহানুভূতি হয়।...যে এক সময় মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর।' 'কথা'-কাব্য ১লা মাঘ, ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয়ে জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত হয়। সেই বৎসরই ২৪শে ফাল্গুন 'কাহিনী' প্রকাশিত হয়। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের রচনাকাল ১৫ ফাল্গুন, ১৩০৬। জগদীশচন্দ্রের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট।

১৮৯৯এর প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা সম্বন্ধে কটু-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তখন কবি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, 'এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।' তিনি জগদীশচন্দ্রকেও এই বিষয় চিঠি লিখে-ছিলেন। জগদীশচন্দ্র লিখেন, 'আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি, যাহারা কার্যে ব্রতী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কার্য সমাধা করিতে পারে না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যাহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর

করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আশীর্বাদ কি আপনার নিকট পৌঁছে না?'

এই পত্র উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন, 'ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন—তোমার ও তাঁহার পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল-লাভ করিয়াছি। বন্ধু হৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত—তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।'

কেবল সমবেদনা নয়, জগদীশচন্দ্রের ১৯০০ সালের ২রা নভেম্বর তারিখের লণ্ডন হতে লিখিত পত্রে তাঁর রবীন্দ্র-প্রচারকার্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব· আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক। লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না?' তারপর ২৩শে নভেম্বর লিখছেন, 'তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই।··তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না।···৬টি গল্প বাহির করিতে চাই···(১৬ই জানুয়ারীর পত্র) তোমার গল্পের পুস্তক···প্রথম খণ্ড হইতে তরজমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। তবে গল্পের সৌন্দর্য ত আছে।'

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র সিলাইদহে তাঁর কাছে যেতেন। তখন অতিথি এই চুক্তি করেছিলেন যে কবি প্রতিদিন একটি করে গল্প লিখে সন্ধ্যায় তাঁকে শোনাবেন। এই চুক্তি একবার কবি সম্পূর্ণ পালন করতে পারেন নি বলে পরে সে গল্প আদায় করবার জন্য—

জগদীশচন্দ্রের চেষ্টা তাঁর ১৮ এপ্রিল, ১৯০০ এর পত্রে দেখা যাচ্ছে।

১৫ অক্টোবর, ১৯০১ জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্বে জানিতে না। হয়তো জান না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে দেখিতে পাই। নিরাশার মধ্যে কে মন বাঁধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে—প্রথম মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতিবৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয়, এখন বিনয়ী, বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল স্বজাতি প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম।' ১লা জানুয়ারী, লিখছেন, 'তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।' ২৩ অক্টোবর, ১৯০৫ এর পত্রে আছে, 'তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গ-ভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।..তারপর সেই আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিত দেওয়া হইবে।...তুমি এ বিষয় অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন তাহা নানা-স্থানে পঠিত হইবে।'

এই নিবন্ধের প্রথমাংশে প্রদর্শিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরাজীতে তর্জমা করে বিদেশে প্রচারের জন্য জগদীশচন্দ্র চেষ্টিত হয়েছিলেন...সে দেশেও বন্ধুর রচনা প্রচলিত করার তাগিদ তাঁর মনে এসেছিল। হয়তো সেই সূত্র অনুসরণ করেই কবি স্বয়ং পরে

গীতাঞ্জলীর কয়েকটি গান ইংরেজী গদ্যে তর্জমা করে (১৯১২) বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই ভাবেই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপলক্ষ্য সূচিত হয়েছিল।

উপরে বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাতীয় মহাবিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সৃষ্টি ইত্যাদির আলোচনা জগদীশচন্দ্রের পত্রে দেখা গেছে। কালে-কালে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির (৩০ শে নভেম্বর, ১৯১৭ প্রতিষ্ঠিত) এবং বিশ্বভারতী (১৯২১—৮ই পৌষ, ১৩২৮ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে আম্রকুঞ্জে উদ্বোধন সভা) দুই বন্ধুর জীবনের প্রতীক হয়ে সমগ্র জগতের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট করেছে—ভারতের জ্ঞান ও চিত্তের ঔদার্য জগৎ-সভায় বিশিষ্ট সম্মান অর্জন করেছে।

২২শে অক্টোবর, ১৯২৮ তারিখে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করি—'তিরিশ বৎসর হইতে আমরা সহযোগী এবং সহকর্মী।...যদি কোন রকমে তোমার অভিষ্ট সাধনে সহায় হতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব। তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে।...সে কার্যে আমি তোমার চির সহায় মনে করিও।...আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি।...আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।...শেষ দিন পর্যন্তও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতেই জীবন অবসান করিব। অন্তত আমরা দুইজন একে অন্যের ভার বহন করিব।'

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম

স্বদেশের গৌরব বর্ধনের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ববর্তী অধ্যায়-গুলিতে দীপ্যমান হয়ে আছে। ভারতবর্ষকে তিনি কি চক্ষে দেখতেন সে আভাস তাঁর লেখা হতেই পাচ্ছি। পূর্বোল্লিখিত পত্রগুলি হতেই উদ্ধৃত হচ্ছে। পাঠের সময় ছন্দপতনের আশঙ্কায় তারিখ পরিত্যক্ত হল—

'প্যারিসে যা যা দেখিলাম, তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি; তেমনি দেশের কথা মনে করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি।...একটি নূতন আবিষ্কার হইল, আর অমনি তাহা কাজে লাগিল।...আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন, অকর্মঠ জাতি আর কত কাল বাঁচিয়া থাকিবে! এ সব মনে করিয়া মনের জ্বালা সম্বরণ করা অসম্ভব।

আমি অনেক সময় না ভাবিয়া লিখি। অনেক সময় বিনা চেষ্টায় মনে অনেক ভাব আসে। শেষে আশ্চর্য হই। সে-যে আমার অতীত, কে আমাকে এসব কথা শুনাইতেছেন? আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন ধন্য হইবে...

অনেক বিষয় পরিষ্কার দেখিয়া ..সমস্ত বুঝিয়া আমাদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদির উপর আমার শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইতেছে। এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে আমরা আধুনিক জাতির সমকক্ষ না হইতে পারি। তবে আমাদের একটি বিশেষ অভাব সেই শিক্ষার যে শিক্ষার বলে wolf-pact একত্র হইয়া অজেয় হইয়াছে...

এতদিন পর যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছু অভিপ্রেত নাই। ..প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি।...অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে! অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?... আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ, তোমরা কেবল নকল করিতে পার, ইত্যাদি কথা, বিদেশী, স্বদেশী অনেকের নিকটও শুনিয়াছি।...আমি সত্যি বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে, তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, তাহা আমার জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে।...

গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি নির্বাপিত রহিয়াছে; কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণ-বায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছে, তাহারই এক কণা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখ দুঃখের অংশী সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও।...

তুমি যে আশ্রমের জন্য কার্য করিতেছ তাহা হইতে অনেক আশা করি। মানুষ গঠন করিতে যদি পার তাহা হইলে আমাদের অনেক দুর্গতি দূর হইবে। তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও। আমাকে যদি শতবার জন্ম-গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।...

হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করে নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে?...তবে হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন। 'আমি' কেহই নই, যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনি সব। তিনি বিশ্বকর্মারূপে আমাদের হৃদয়মন পরাস্ত করিয়াছেন। আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে।...যে মৃত্তিকাতে আমার শরীর গঠিত হইয়াছে সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ মন পর্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার নাই। তোমার আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে।...

আমেরিকানরা এদেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য manufacture ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এদের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপর পড়িবে। যদি একে একে উপায় পরহস্তগত হয় তাহা হইলে নির্লোপ হইবার দেরী নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া

লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও। জাপানের সমৃদ্ধি কেন বাড়িতেছে? আমি তো উক্ত দেশের অনেক দেখিয়াছি। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে আমাদের দেশে অন্য দেশের তুলনা করিলে তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতে কিছুই আশা নাই? চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে?…

ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব।…যাহা প্রকৃত যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহায়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে, তাহার ভিতর দেখিয়াছি।…অন্তরে কিম্বা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্টলাভ করিব না।…সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতন কাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইলে আমরা প্রকৃত ও অপ্রাকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব। সহস্র অজানার মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে। সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।…'

এরপর জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন। তখন দুইবন্ধুতে ভারতের প্রাচীন ধর্ম, কৃষ্টি ও শিল্প প্রচারের জন্য নানা পরামর্শ করতেন। সেই সূত্র ধরে জগদীশচন্দ্রের পত্র হতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি—

'তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস হইতেছে।....নবদ্বীপ তো সতীশ যাইবে।… এখন একজন সংস্কৃত ও ইংরাজীবিদ ছাত্র সন্ধান করিয়া ছ মাস Asiatic Societyতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibet-এর Mss. ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তিনি

চীনদেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পুঁথির কপি করিবেন। এই প্রথম exploration হইতে অনেক তত্ত্ব বাহির হইবে। কোন কোন দিকে অনুসন্ধান কার্যকর হইবে, এই preliminary কাজ হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।...

স্বামী উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। কেম্ব্রিজে বৃহৎ কার্যের সূচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র বিদেশীর নিকট পরিচিত হইবে ইহা আমি বহু মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া মনে করি। বিলাতে উপযুক্ত অধ্যাপক পাঠান আবশ্যক। এজন্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত...ব্রজেন্দ্রবাবুর এ সম্বন্ধে বহু কথা সংগৃহীত আছে।'

আমাদের ধারণা এই যে জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম উপরের উদ্ধৃতি হতে যে কেবল প্রতিপাদিত হল তা নয়। তিনি যেন ভারতের প্রজ্ঞা ও কৃষ্টি দিকে দিকে প্রচার করে পরাধীন ভারতবাসীকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন।

বসু-দম্পতির স্বদেশভ্রমণ

কেবল প্রজ্ঞা ও কৃষ্টি নয়। ভারতের ধর্ম, শিল্প ও শৌর্য কাহিনী তাঁদের গভীর ভাবে উৎসাহিত করেছিল। বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ হতেই তাঁরা দুজন ভারতের নানাতীর্থে বেড়াতে যেতেন। দুজনেই নিজ নিজ পিতৃকুলের প্রভাবে ভারতের ধর্ম, সমাজ ও শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এবং কালে কালে এই অনুভূতি আরও বর্ধিত হয়েছিল দেশের নানা তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে। বিবাহের পর হতেই তাঁরা প্রতিবৎসর কলেজ ছুটির সময় দু-বার করে কলকাতার বাইরে চলে যেতেন।

আচার্য বসুর গবেষণার বিষয় হল প্রকৃতির লীলা। সেই লীলার সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তি ধরা দিত তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে—পর্বত-শীর্ষে, উপত্যকায়, কাননে, নদীতীরে, হিমপ্রবাহে। ভারতের ভূভাগে ভারতের ধর্মের ও শাস্ত্রের নানা মন্দির ও মঠ যুগ যুগ ধরে কত যাত্রী ও জিজ্ঞাসুকে আকর্ষণ করে এনেছে। বসু দম্পতিও কতবার এই সব তীর্থ দেখে বহু বহু আলোকচিত্র সংগ্রহ করে আনতেন—ভারতের ধর্ম ও শিল্পের কত গৌরব সেই ছবিতে আঁকা।

প্রিয়দর্শী অশোকের মহিষী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের স্মৃতিস্তূপ সাঁচীতে তাঁদের প্রথম তীর্থ-যাত্রা। এখান হতেই অশোকের পুত্র ও কন্যা সিংহলে ধর্মপ্রচারে যাত্রা করেছিলেন। এখান হতে তাঁরা পুণ্যতোয়া তাপ্তী ও নর্মদার সংযোগ স্থলে মান্ধাতায় ভীম-অর্জুন প্রভৃতির বীরগাথা-বিজড়িত এখানকার প্রাচীন মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন।

রাজপুতবীরগাথা ও নারীর আত্মত্যাগের স্মৃতিতীর্থ চিতোর দেখে বেড়ালেন একবার। আজমীঢ় আর বিখ্যাত হ্রদতীরস্থিত পুষ্করতীর্থও দেখা হল।

এরপর দেখলেন, আধুনিক জয়পুর আর সেখানকার বিখ্যাত প্রাচীন মানমন্দির। আগ্রা, দিল্লী দেখা হল। একবার স্বাস্থ্যের জন্য তাঁরা নৈনীতাল ছিলেন। সেখান হতে তাঁরা লক্ষ্ণৌ দেখে আসেন এবং অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আচার্য বসু একাকী পিণ্ডারী হিমপ্রবাহ দেখতে যান। সেই দুর্গম পথযাত্রায় তাঁর যে অভিজ্ঞতা জন্মে তারই সাহসে পরবৎসর তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে আবার সেখানে নিয়ে যান।

একবার তাঁরা কাশ্মীর উপত্যকা ভ্রমণ করেন—দুই বৎসর পর কাশ্মীরের মহারাজার অতিথি রূপে আবার সেখানে গিয়েছিলেন।

ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির, উদয়গিরির গুহা, অশোকের শিলালিপি, পুরীর সমুদ্র ও মন্দির, কণারকের ধ্বংসাবশেষ, চিল্কা হ্রদ একবার দেখা হল।

দুইজনে একবার অজন্তা ও ইলোরার শিল্প দেখে এলেন। পরে আবার তাঁরা গিয়েছিলেন সেখানে—সাথে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং চিত্রশিল্পী মিসেস হেরিংহ্যামের শিল্পীদল—তাঁরা অজন্তা-চিত্রাবলী নকল করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। অব্যক্তে উদ্ধৃত 'যুক্তকর' প্রবন্ধ (১৮৯৪ তে লিখিত) অজন্তা দেখার অনুভূতি বহন করে আছে।

পাটনার কাছে পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার কাছেই অশোকের রাজধানী বলে খ্যাত অনেক চিহ্ন দেখা যায়। সেখানে মোগল আমলের ও পারশ্যভাষায় পুস্তকের এক পুস্তকাগার আছে। এসব তাঁরা দেখে আসেন।

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থানেও তাঁরা গিয়েছিলেন। শিখদের কীর্তি তাঁদের এতখানি উৎসাহিত করেছিল যে তাঁরা পরে একবার অমৃতসরে চলে যান—সেখানকার স্বর্ণ-মন্দিরের পূজা ও শোভা তাঁদের বিশেষ আকৃষ্ট করে।

এমনি করেই তাঁরা বোম্বাই প্রদেশের গুহামন্দিরগুলি দেখে বেড়ান—এলেফ্যাণ্টা, করলী ও কেনহারী। এরপর দেখেন মহারাষ্ট্র দেশ—শিবাজীর বীরত্ব কাহিনী বিজড়িত নানা জনপদ ও পরিবেশ।

ইউরোপ ও আমেরিকা হতে যখন ১৯১৫ সনে ফিরছিলেন তখন কলম্বোয় নেমে তাঁরা সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন। সিংহল হতে এপারে এসে তাঁরা রামেশ্বরম তীর্থে আসেন। সেখান হতে মাদুরা, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর মন্দিরগুলি দেখে তাঁরা শ্রীরঙ্গমে আসেন। শ্রীরঙ্গমের পুরোহিত তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করতে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁরা বিদেশ হতে সদ্যপ্রত্যাগত, ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিলেন। পুরোহিত বললেন, 'তোমরা সাধু, তোমরা স্বচ্ছন্দে এসো।'

কুমায়ুন অঞ্চলে তাঁরা কয়েকবার গিয়েছিলেন, এবং মায়াবতীতে ছিলেন একবার সাধুদের সঙ্গে। ১৯০৪ সনে অক্টোবর মাসে তাঁরা

পূর্ণিমার সময় বুদ্ধগয়ায় সেখানকার মোহন্তের অতিথিশালায় দিন সাতেক ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, গুপ্তমহারাজ, ব্রহ্মচারী অমূল্য, যদুনাথ সরকার সহযাত্রী ছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় বুদ্ধের জীবনী ও স্তোত্র পাঠ হত। তাঁরা বৌদ্ধ-স্মৃতি জড়িত রাজগীরও দেখলেন।

একবার তক্ষশিলার খনন কার্য দেখে এলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষও দেখে এলেন একবার। আর একবার গেলেন তাঁরা দুর্গম বদরীনাথ ও কেদারনাথ দর্শনে; হরিদ্বারের পর সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে, কতক কতক বা বাহন সম্বল করে।

এমনি করে তাঁরা সমগ্র ভারত বিমুগ্ধ দেশপ্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে বহুবৎসর ধরে দেখলেন। তখনকার দিনে পথচলা সহজ ছিলনা—পথ দুর্গম, আহার ও বাসস্থান অব্যবস্থিত; চোর ডাকাতের উপদ্রবও ছিল। কিন্তু দেশের ধর্ম, মানুষ ও শিল্প তাঁদের অন্তরের ধন। তাদের টানেই তাঁরা ঘর হতে বেরিয়ে পড়তেন এবং বর্তমান কালের জগতে ভারতের আসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্বোধিত হতেন।

জগদীশচন্দ্রের বান্ধব

পিতামাতা, রবীন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্র দত্তের বান্ধবতার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তাঁর বোনেরা সবাই তাঁর অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁর খেলার সাথী বড় বোন সরলপ্রভা (আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী) তাঁর বিজ্ঞান সাধনায়ও উৎসাহ দিতেন। সরলপ্রভাই তাঁদের দমদমের বাগানে তাঁকে বনচাঁড়াল গাছের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন। সরলপ্রভা, সুবর্ণপ্রভা (ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর স্ত্রী, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর মাতা), লাবণ্যপ্রভা (ডাক্তার হেমচন্দ্র সরকারের স্ত্রী), কুমারী হেমপ্রভা (M. A.), কুমারী চারুপ্রভা (২৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু)—

সকলেরই সাহিত্যপ্রীতি, সমাজসেবা, ও দেশপ্রাণতা তাঁর জীবনের প্রীতিকর পরিপোষক হয়েছিল।

সহধর্মিণী অবলাদেবী তাঁর সারাজীবনের সাথী, তাঁর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, অমন সুগৃহিণী দুর্লভ। বহু কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন, স্বামীর সাধনার কোন বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য সদা-জাগ্রত থাকতেন। প্রতি বিদেশ-যাত্রা, স্বদেশ-ভ্রমণে তিনি স্বামীর সহযাত্রী হতেন। স্বামীর বন্ধু ও ছাত্র বাড়ীতে এলে আপ্যায়ন করতেন।

জগদীশচন্দ্র এদেশে বা বিদেশে থাকার সময়ও, সম্ভব হলে দেশী রান্না—মাছের ঝোল প্রভৃতি খেতেন। অবলাদেবী স্বয়ং তা রান্না করে দিতেন। আচারে, ব্যবহারে, পোষাকে তাঁদের ভারতীয় সৌজন্য ও সহজভাব পরিস্ফুট হত। অথচ ডাঃ বসু তাঁর শেষ জীবনের প্রায় ২৫ বৎসর মাসিক ১৫০০৲ (এখনকার দিনের প্রায় ৫০০০৲এর সমান) বেতন পেতেন। তবু অবলাদেবী সম্ভাব্য বিলাস বর্জন করে স্বামীর অনুবর্তী হয়েছিলেন।

তাঁদের একটি শিশু জন্মেছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। এই সন্তানহীন দুইজনের স্নেহ তখন পরস্পরকে আরও নিকটবর্তী করেছিল। অবলাদেবীর শিক্ষাও তাঁকে স্বামীর গবেষণার তাৎপর্য বুঝবার সামর্থ্য দিয়েছিল এবং সেই জন্য সহজেই তিনি স্বামীর গৌরবের অংশভাগিনী হয়েছিলেন। স্বামীর সংসার ও হিসাব পত্রেরও অনেকটা তিনি দেখতেন। বাঙ্গালা দেশের স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও অবলাদেবীর দান কম নয়। বিখ্যাত ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের পরিচালক-সমিতির তিনি দীর্ঘকাল কর্ণধার ছিলেন। ১৯১৯ সনে তিনি নারী শিক্ষা সমিতি ও বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্থাপন করেন এবং আমৃত্যু এই সমাজ-উন্নতি-কার্য পরিচালনা করেছিলেন।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সনে জগদীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। জগদীশচন্দ্রের প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে বসু-বিজ্ঞান-

মন্দিরের ট্রাষ্টিদের হাতে ১৩ লক্ষ টাকা ন্যস্ত ছিল। অবলাদেবী স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে অবশিষ্ট ৪ লক্ষ টাকা স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিতরণ করে দিয়েছিলেন। এই ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেওয়া হয় বাঙ্গালী-বিহারী সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য, ১ লক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে, ৫০ হাজার প্রেসিডেন্সি কলেজে, ১ লক্ষ নারীশিক্ষার প্রসারার্থে, বাকী টাকা অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৫১ সনে অবলাদেবী পরলোকগমন করেন। এই হিন্দুনারী পরলোকে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

১৮৯৯ সনে স্বামী বিবেকানন্দ অনুরক্ত আমেরিকান মহিলা মিসেস ওলবুল ও ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বিবরণ কলকাতায় শুনে তাঁকে দেখতে আসেন। তদবধি যে বান্ধবতার সৃষ্টি হয় তা আজীবন ছিল। প্যারিস-প্রদর্শনীর পর বিলাতে জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল। খবর পেয়ে মিসেস ওলবুল আমেরিকা হতে বিলাতে চলে এসে তাঁর জন্য উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসক নিযুক্ত করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। ১৯০৭ সনে তিনি আমেরিকায় গিয়ে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন। তখন বোষ্টনের অধিবাসী সঙ্গতিপন্ন মিসেস বুলের ভাই মিঃ জে. জি. থরপের সঙ্গেও তাঁর বান্ধবতা জন্মেছিল। ১৯১৪ সনে আবার যখন তিনি আমেরিকা যান তখন মিসেস বুলের মৃত্যু হয়েছিল। তখন তিনি মিঃ থরপের বাড়ীতেই অতিথি ছিলেন। বসু দম্পতির ভারতীয় মন স্বজনের প্রতি স্নেহান্বিত ছিল, কিন্তু বিদেশীর প্রতি তাঁদের কোন বিদ্বেষ ছিল না।

ভগিনী নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের পরম বান্ধবী। এদেশে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর গবেষণার বিঘ্নাদি দেখে নিবেদিতার স্বাধীন দেশের চিত্ত মর্মপীড়িত হত। ১৯১১ সনে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৯৯ সন হতে প্রায় ১২ বৎসর সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার মাতৃস্নেহ

জগদীশচন্দ্রের পরিপোষক হয়েছিল। ১৯০১ সনে বিলাতে রোগশয্যা হতে উঠে তিনি কিছুদিন ভগিনী নিবেদিতার কাছে তাঁদের উইমবেল্‌ডনের বাড়ীতে ছিলেন। উড়িষ্যা, কেদারবদরী, তক্ষশীলা, নালন্দা ও অজন্তা দর্শনে ভগিনী নিবেদিতা বসু-দম্পতির সহযাত্রিনী ছিলেন। এদেশে নিবেদিতার নানা দেশহিতকর কর্মে জগদীশচন্দ্র অর্থ সাহায্য করতেন।

ভারতীয় শিল্পের প্রতি জগদীশচন্দ্রের আকর্ষণ হেতু শীঘ্রই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি ঘটে এবং তিনি তাদের শিল্প চর্চার সহায় হন। নন্দলাল বসুর সঙ্গেও ক্রমে তাঁর যোগ স্থাপিত হল। তাঁর নিজের বাড়ী ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির অলঙ্করণে নন্দলাল বসুর শিল্পকলা দেশীবিদেশী বিদগ্ধজনের চিত্তে এক আনন্দলোক সৃষ্টি করে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁর পরস্পরের গুণগ্রাহী বান্ধব। গোখেল ও গান্ধিজীর সঙ্গেও তাঁদের কাজে তাঁর সংযোগ ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর বৈজ্ঞানিক ছাত্রদল ছড়িয়ে আছেন। তাঁরাও তাঁর বান্ধব। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্র। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন, সেখানেও তাঁর বহু বান্ধব ছিলেন। তাঁর জীবনী-কার অধ্যাপক পেট্রিক গেড্ডেসের (১৯২০) বান্ধবতাও উল্লেখযোগ্য।

আর কালে কালে সব চাইতে বড় বান্ধব হয়েছিল উদ্ভিদ—যাদের জীবন-ধারা তিনি বুঝতেন। তারাও বুঝি তাঁর সাথে কথা বলত, তাঁদের সুখদুঃখও জগদীশচন্দ্রের জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই জগদীশচন্দ্র এদের ছাড়া থাকতে পারতেন না। দার্জিলিঙে তাই নিজের বাড়ীর সঙ্গে বাগান ও গবেষণাগার করেছিলেন। বিলাতে ১৯১৪ সনে যখন গিয়েছিলেন তখন মাইডা ভেলের (Maida vale) বাড়ীতে বাগান ও সাময়িক গবেষণাগার সৃষ্টি করেছিলেন। আর সৃষ্টি করেছিলেন কলকাতা হতে ২০ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে ছোট্ট

একটি স্রোতস্বতীর মোহনায় ফলতায় একটি বাগানবাড়ী—সেখানেও তার গবেষণা চলত। অপার সার্কুলার রোডে তাঁর বাড়ীর পার্শ্বে ভবিষ্যতের বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্যান তো তাঁর বহুদিনের বান্ধব।

বক্তা জগদীশচন্দ্র

আর তাঁর বান্ধব হয়েছিলেন সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষিত জনগণ, যাঁরাই তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। গবেষণার প্রথম কয়েক বৎসর তাঁর বিরুদ্ধে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা অপসৃত হলে তাঁর বক্তৃতার শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর বান্ধব হলেন। এই প্রশংসমান জনসংঘ, সর্বদেশের গুণী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাঁর অভীষ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই বইএর লেখক বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে একদিন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বহু জনসমাগম হয়েছিল এবং অতি স্বচ্ছ ভাষায় বিষয় বস্তু আচার্যদেব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পরীক্ষাগুলির চমৎকারিত্ব ও বক্তার সহজ সরল ভাষা, কখনও বা কৌতুক, বড়ই উপভোগ্য হত।

তাই অধ্যাপক জীবনের প্রারম্ভ হতেই ছাত্রগণ তাঁর বশীভূত হয় এবং বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ মঞ্চে যখনি তিনি তাঁর আবিষ্কার-বিষয় বক্তৃতা করতেন তখনি তা সর্বজনবোধ্য ও প্রিয় হত। কলকাতার টাউন হল, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, রোটারী ক্লাব, সাহিত্য পরিষদ্, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা প্রভৃতি স্থানের বক্তৃতা এবং ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে তাঁর দুই দিনের বক্তৃতা এ দেশের বহুজনের আনন্দের স্মৃতি হয়ে আছে।

ময়মনসিংহে একদিন বক্তৃতা হবে, কথা ছিল। কিন্তু লোক সমাগম বেশী হওয়ায় স্থানাভাব হেতু দামী টিকিট করে শ্রোতার সংখ্যা কমাবার চেষ্টা হয়। জগদীশচন্দ্র আদৌ প্রবেশ মূল্যে আপত্তি করেন এবং স্বেচ্ছায় দুইদিন বক্তৃতা করেন। প্রথম দিন ইংরাজীতে, দ্বিতীয় দিন বাংলায় তাঁর ছাত্র অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সেখানে তাঁর

বক্তৃতার সঙ্গে পরীক্ষাগুলি দেখিয়েছিলেন। তাঁর সহজ বাংলা বক্তৃতা তাঁর কঠিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে এত সহজ করেছিল যে উপস্থিত অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যসেবীদের আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এ দেশে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতার তালিকা পরিশিষ্ট (ঙ)তে প্রদত্ত হল।

তিনি বক্তৃতার সময় শান্ত, ধীর ও আত্মসমাহিত থাকতেন। কোন কমিশনে সাক্ষ্য দানের সময়ও তাই। Royal Service Commission এ সাক্ষ্য দেবার সময় নাকি তিনি একটি বড় কাগজে 'চটো না' কথাটি বড় করে লিখে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেবার সাক্ষ্যে অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে দেশী লোকের যদি সাহেবদের মত বেশী বেতন দাও তবে আমরাও তাদের মতই বোকামী-খরচ করতে পারব। অতঃপর একই চাকুরীতে দেশী বিদেশীর বেতন সমান করা হয়।

বিদেশেও তাঁর বক্তৃতা দ্বারা বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ লোক খুব আকৃষ্ট হতেন। যখন তিনি বিলাতে সাড়া-চিত্র দ্বারা প্রমাণ করে দেখাতেন যে ধাতু ও তরকারীরও প্রাণ আছে তখন তাঁর আবিষ্কারের কথা সেখানকার সাময়িক পত্রে, গম্ভীর ও কৌতুককর, দুই রকম প্রবন্ধ দ্বারাই ঘন ঘন প্রচারিত হত।

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৮) জগদীশচন্দ্রের খুব প্রশংসা হয়। তখন জগৎ-বিখ্যাত আইনষ্টাইন বলেন যে জগদীশচন্দ্রের জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত। মনস্বী রঁম্যা রলাঁ বলেন, তুমি প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়েছ, আমার নমস্কার গ্রহণ কর। ভিয়েনার বিখ্যাত অধ্যাপক মলিস বলেছিলেন, প্রাচ্য হতে একদিন পশ্চিমে জ্ঞানের আলো এসেছিল, জগদীশচন্দ্র আবার তার সূচনা করেছেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক মলিস বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে এসে অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন। (১৯৩০)

বস্তুত তাঁর নব নব জ্ঞানপ্রদায়ী বক্তৃতা জগতে তাঁর জন্য অতি উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ভারতগৌরব বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র

১৯১৭-১৯৩৭

৩০ শে নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির তাঁর কীর্তি-সৌধ। ১৯.৯ সনে আবার তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পাশ্চাত্য দেশে প্রেরিত হয়েছিলেন। সর্বত্র তাঁর জয়পতাকা আলোড়িত হয়েছিল। এবার অ্যাবারড়িন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল-এল-ডি উপাধি প্রদান করেন। যে রয়াল সোসাইটি তাঁর পদার্থ বিদ্যা-বিষয়ক আবিষ্কারের প্রবন্ধাদি ১৮৯৪ সন হতে নিজের পত্রিকাদিতে প্রচার করছিলেন, কিন্তু জড় ও উদ্ভিদের সাড়া বিষয় গুরুতর আপত্তি করেছিলেন, তারা এত বৎসর পর ১৯২০ সনে তাঁকে সদস্য শ্রেণীভুক্ত করলেন। জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি তখন সমস্ত পৃথিবীতে। League of Nations-এর Intellectual Co-operation কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়ে তিনি ১৯২৬-২৭ সনে আবার ইউরোপে গেলেন। এই উপলক্ষে ১৯৩০ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসর তাঁকে সেখানে যেতে হত। ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৮ সনে কলকাতা টাউন হলে এক সম্বর্ধনা সভা হয়। দেশ ও বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান ও গভর্ণমেণ্ট মহাসমারোহে এতে সানন্দে যোগ দেন। তাঁর ৭৫ বৎসর বয়স হলে ১৯৩৪ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি সম্বর্ধিত হন। কিছু দিন হতেই তাঁর শরীর আর সবল ছিলনা। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজ আর প্রত্যহ করতে পারতেন না, মাঝে মাঝেই কলকাতার বাইরে চলে যেতেন। কিন্তু সেখানকার সব খবরই রাখতেন। দার্জিলিঙ তাঁর খুব পছন্দ হত। কিন্তু ইদানিং সেখানে তাঁর শরীর টিক্‌ত না। তাই গত বছর চারেকের অভ্যাস অনুযায়ী ১৯৩৭ সনের নভেম্বরের ২রা তারিখ গিরিডিতে চলে গিয়েছিলেন। ২৩শে নভেম্বর সকাল ৮টায় অকস্মাৎ সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯১৭ হতে ১৯৩৭—এই

২০ বৎসরে তাঁর রচিত গবেষণা-গ্রন্থগুলির তালিকা পরিশিষ্ট (ঘ)তে দেওয়া হল। ৭ দিন পরে, তাঁর জন্মদিনে তাঁর চিতাভস্ম বসু-বিজ্ঞান-মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন মন্দির মধ্যে রক্ষিত হয়েছে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা তাঁর বহু বৎসরের সাধনার ফল। বসুদম্পতির সংযত ব্যয়জনিত সঞ্চয়, আচার্য বসুর Emeritus-অধ্যাপকের মাসিক ১৫০০৲ বেতন, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পাতিয়ালা, বরদা প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজামহারাজার এককালীন ও বার্ষিক দান এবং এমনি বহু সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সহায়তা, (সাকুল্যে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার দান সংগৃহীত হয়েছিল) সবই এই বিজ্ঞানাগারের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। ভারত গভর্ণমেণ্টও ব্যয় নির্বাহ জন্য বার্ষিক বৃত্তিদানে প্রতিশ্রুত হলেন। মন্দিরগাত্রে তিনি লিখে দিলেন, 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম। শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, ১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪।'

জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পর এই প্রতিষ্ঠানটি কি রকম চলছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

প্রায় ১০ বিঘা জমির উপর এই আয়তন, বহু অট্টালিকা এবং বিস্তীর্ণ উদ্যান—তাতে নানা বিভাগীয় বিবিধ গ্রন্থাগার, যন্ত্রের কারখানা, ও পাঠ নেবার স্থান। প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪।৫৫ বৎসরের কার্য বিবরণী হতে কতক তথ্য উদ্ধার করে দিচ্ছি। এতে এখানকার কার্যের ধারণা হবে।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, সুধাংশুমোহন বসু, কেদারনাথ চাটার্জি, সুধীরকুমার মণ্ডল, শিশিরকুমার মিত্র, অবনীনাথ মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র

নিয়োগী ও ভূপতিমোহন সেন পরিচালক সমিতির সভ্য। কার্য-নির্বাহক সমিতিতে শ্রীযুক্ত নিয়োগী বাদ আর সবাই আছেন, আর আছেন ভারত গভর্ণমেন্ট, লোকসভা ও কলকাতা পৌরসভার কয়েকজন প্রতিনিধি। তাঁরা আগামী ৫ বৎসর জন্য ১০,১৭,৮০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেছেন।

বিবিধ গঠনমুলক কাজের জন্য এবৎসর ভারত গভর্ণমেণ্ট হতে এককালীন ১,৪০,০০০৲ দান পাওয়া গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়েছেন ৪০,০০০৲। তা ছাড়া বার্ষিকী পাওয়া গেছে, ভারত গভর্ণমেণ্টের ২,৩৫০০০৲, গবেষণার কাজে দীক্ষা দেবার জন্য আবার ১০,১৪১৸০ এবং পরিচালক সমিতি দিয়েছেন ৪৫,৮৯৪৲।

গবেষণার কাজের জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি সাহায্য এবৎসর জন্য পাওয়া গেছে।

দাতা	কাজ	টাকার অঙ্ক
কেন্দ্রীয় পাট কমিটি	বীজের উন্নতি	৯,৭৩৮৲
„ তৈল বীজ কমিটি		২৭,২৫০৲
„ কৃষি গবেষণা সমিতি	আগাছা নিবারণ	১৫,৫৪১৷৴১০
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সমিতি	বীজনাশক ঔষধ প্রস্তুত	১১,১৬৫৲
পরমাণু শক্তি সমিতি	গবেষণা	৭৫,০০০৲
স্যার জগদীশ অছি সমিতি (১নং)	গবেষণার বৃত্তি ইঃ	৬,০০০৲

প্রতিষ্ঠানে;পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, বীজতত্ত্ব ও জীববিদ্যা বিষয়ক গবেষণা বিভাগ আছে; এই সব বিভাগ ও উপরোক্ত গবেষণা-বৃত্তিগুলির কাজে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। নিজেদের ও বাইরের নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই গবেষণাগার হতে উদ্ভূত প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্মা অয়েল কোম্পানী দত্ত বৃত্তির কাজও এখানে চলেছিল।

জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত উদ্ভিদের প্রাণশক্তি সম্বন্ধীয় আরও বিচিত্রতর অনুসন্ধান এখনও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি-কে-দত্ত, এ-গুহঠাকুরতা প্রভৃতির হাতে চলছে। তাঁরা আচার্যের হাতে দীক্ষা পেয়েছিলেন। এই বিস্তীর্ণ, বিচিত্র ও বিবিধ গবেষণাকার্য-সমাকুল প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর অধ্যক্ষতায় সুপরিচালিত হচ্ছে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় বার্ষিক ৪০,০০০৲ আয়ের যে অছি-তহবিল করেছিলেন তা হতে অবলাদেবী যতদিন বেঁচে ছিলেন, কিছু মাসহারা পেতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সব আয়ই দানে ব্যয় হয়।

জগদীশচন্দ্রের জীবনের শিক্ষা

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে রচিত তাঁর অভিভাষণে তাঁর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাই। তা হতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি; তাঁর জীবনের শিক্ষা ও বাণী এই কথাগুলিতে অতি স্বচ্ছভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে।

'যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল নিরপেক্ষ থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাসনয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

যে সরল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত ও বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের

পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন।…আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার অটল সাহচর্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে।

যে আশায় কার্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্মস্পর্শ করিয়াছে। এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।…নূতন আবিষ্কার এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার পর সেই তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্মিত হইয়াছে।…দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে।…সর্বজাতির, সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্র-পটে অঙ্কিত করিয়াছেন।

অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। দেশ বিজয়ে মহাসাম্রাজ্য কোন দিন স্থাপিত হয় নাই।…ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখ মোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল।…এই আমলকের চিহ্ন মন্দির গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত, যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা

নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।'

জগদীশচন্দ্রের জীবনপাত্রের এই নৈবেদ্য তাঁর জীবনসাধনার প্রতিচ্ছবি। যুগে যুগে কত ঋষি ভারতে জন্মগ্রহণ করে এদেশের প্রজ্ঞা ও ঐতিহ্যকে জগত-সভায় উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কত দেশ দেশান্তর হতে কত তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁদের টানে এদেশে যুগ যুগ ধরে তীর্থযাত্রায় এসেছে। জগদীশচন্দ্র আমাদের সেই রকম একজন জ্ঞান-তীর্থ-গুরু। তিনি আমাদের প্রণতি গ্রহণ করুন।

পরিশিষ্ট (ক)

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার-প্রবন্ধের তালিকা ;

১৮৯৪ হতে ১৮৯৭

1. The polarisation of electric ray by crystals—(J. A. S. B May, 1895).
2. On a New Electropolariscope. (The Electrician, Dec., 1895).
3. On the Double Refraction of the Electric Ray by a strained Di-electric (The Electrician, Dec., 1895).
4. On the determination of the Index of refraction of Sulphur for the electric ray (Proc. Royal Soc. Oct.. 1895).
5. On a simple and Accurate Method of determining the Index of Refraction for light (Nov., 1895—unpublished paper).
6. Determination of the wave length of Electric radiation (Royal Soc. Jan., 1895).
7. On a complete apparatus for investigating the properties of Electric Waves—British Association, Liverpool, 1896.
8. On selective conductivity exhibited by polarising substances (Proc. Royal Soc. Jan,, 1897).
9. Friday Evening discourse at the Royal Institution on Electric Waves (Royal Institution, Jan., 1897).
10. On Electro-magnetic Radiation (Physik-Ges. Zu. Berlin, April, 1897).

পরিশিষ্ট (খ)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার-প্রবন্ধের তালিকা ; ১৮৯৮ হতে ১৯০২,
ফিজিক্স হতে ফিজিকো-ফিজিওলজি

11. On the Determination of the Index of Refraction of glass for the Electric Ray—Proc. Royal Society. Nov., 1897.
12. On the Influence of thickness of Air-space on total Reflection of Electric Radiation. (Royal Society, Nov., 1897).
13. On the rotation of plane of polarisation of Electric Waves by a twisted structure—Royal Society, March, 1898.
14. On the production of a Dark cross in the Field of Electro-magnetic Radiation (Royal Society, March, 1898).
15. A self-recovering coherer and study of cohering action of different metals. (Royal Society, March, 1899).
16. On the electric touch and the Molecular changes produced in matter by the action of Electric Waves. (Royal Soc. Feb., 1900).
17. De la Generalite des Phonomences Moleculaires products par Electricite la Matiere Vivante-Travaux du Congres Internationale de Physique, Paris, 1900.
18. On the similarity of effect of Electric stimulus on Inorganic and Living substances—British Association, Bradford, 1900.
19. On an Artificial Retina-Exhibited at British Association and Royal Institution, 1900.
20. On Binocular Alternation of Vision—Physiological Soc. London, 1900.
21. On the continuity of effect of Light and Electric radiation on Matter—(Royal Soc. April, 1901).

22. On the similarities between Mechanical and Radiation strain—(Royal Soc. April, 1901).
23. On the strain theory of Photographic action. (Royal Soc. April, 1901).
24. On the change of conductivity of metallic particles under cyclic Electromotive variation. (British Association, 1901).
25. The conductivity curvograph—British Association, Glasgow, 1901.
26. On the response of Inorganic Matter to stimulus-Friday Evening Discourse. Royal Institution, May, 1901.
27. On the Electric Response in ordinary plants under mechanical stimulus. (Linnean Society, March, 1902).
28. Sur La Response Electrigue de la Matiere Vivante (Society de Physique, Paris, 1902).
29. On the Electromotive wave accompanying mechanical Disturbances in Metals. (Royal Society, May, 1902).
30. The lalent image and Molecular strain theory of Photographic Action—(Transactions, Photographic Society, London, June, 1902).
31. On the Electric pulsation accompanying Automatic movements in Desmodium gyrans (Linnean Soc. 1902).
32, এই সময়েই তাঁর 'Response in the Living and the Non-living' (Longman & Green & Co., 1902) পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। বিষয় ও সময়ের সূত্র রক্ষার্থে তা এই তালিকাভুক্ত করা হল।

পরিশিষ্ট (গ)

বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার-প্রবন্ধের তালিকা ; ১৯০৩—১৯১৬ ; উদ্ভিদের
জীবন সম্বন্ধেই এই গবেষণা, তখন তাই-ই
তাঁর ধ্যান ও গবেষণার বিষয়।

33. The mechanical Response of Ordinary Plants.
34. Effect of Drugs on Response of Plants.
35. Death-spasm in Plants.
36. The monograph.
37. Polar Effect of current in Excitation of Plants.
38. Electro-Tonus in Plants.
39. Electro-tactile Response.
40. Multiple response in plants.
41. Inquiry into causes of Automatic pulsation.
42. Influence of temperature on Automatic-response
43. Effect of various Drugs on the Rhythmic pulsation of plant.
44. The different effects of Drugs on Plants of Different constitutions.
45. The shoshungraph for Researches on the Ascent of Sap.
46. The growth recorder.
47. The balanced crescograph.
48. Researches on Thermo-cresent curve.
49, Researches on Positive and Negative Geotropism.
50. Determination of the laws of Growth.
51. Fundamental Responsive action of plant to the stimu lus of light.
. Researches on Positive and Negative Heliotropism.
53. Researches on Diurnal sleep.
54. Torsional response under stimulus of light and gravity.
55. এই সময়ই তাঁর 'Plant Response as a means of Physiological Investigation' (Longmans & Co, 1906) পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। বিষয় ও সময়ের সূত্র রক্ষার্থ তা এই তালিকাভুক্ত করা হল।

56. The Electromotive Response of plant.
57. The relation between stimulus and Response.
58. Rheotomic observation of Electric Response of plant.
59. Demonstration of Dual character of Response.
60. Detection of Physiological Anistrophy by Electrical Response.
61. Natural current in a plant and its variation.
62. Electrical Investigation on the Action of Drugs on plant-tissue.
63, Determination of Variation of Excitability of plant-tissue by method of interference.
64. The current of Injury and Negative variation in plant.
65. Current of death.
66. Effect of temperature on Electrical Response.
67. The Electrical spasm of death.
68. Multiple and Autonomous Electical Response.
69. The Electrical Response of leaves.
70. The leaf considered as an Electrical organ.
71. The theory of Electrical organ.
72. Researches on Electrical Response of skin, Epithelium, gland and Digestive organs in plant and animal.
73. Electric Response of plant to the stimulus of light.
74. Geo-Electric Response,
75. The conductivity Balance.
76. Response by variation of Electric Resistivity.
77. Molecular theory of Excitation and its Transmission.
78. Inorganic and Organic Memory.

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-পুস্তকের তালিকা ; ১৯০৩—১৯১৬

1. Response in the living and Non-living (1902), 199 pages, 117 illustrations.
2. Plant Response as a means of Physiological investigation (1906), detailing 315 experiments, 781 pages, 278 illustrations.

(পুস্তকগুলির নাম একসঙ্গে রাখার উদ্দেশ্যে এ দু'টির নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করা হল)

3. Comparative Electro Physiology, a physico-physiological study (1907), with 321 experiments, 760 pages, 406 illustrations.
4. Researches on Irritability of plants (1913)—with 180 experiments, 376 pages, 190 illustrations.

পরিশিষ্ট (ঘ)

আবিষ্কার-পুস্তকের তালিকা ; ১৯১৭ হতে ১৯৩৭

5. The Physiology of Photosynthesis (1924).
6. Nervous Mechanism of plants (1926).
7. Collected Physical Papers (with a foreward by Sir J. J. Thomson, O. M., F. R. S)—1927.
8. Plant Autographs and their revelations (1927)—Dedicated 'To my wife who stood by me in all my struggles').
9. The motor Mechanisms of plants (1928).
10. Growth and tropic movements of plants (1929)-Inscribed to 'His Highness Bhupendra Singh Mahinder Bahadur Maharajadhiraj of Patiala for his enlightened and generous interest in the Bose Research Institute'.

জগদীশচন্দ্র সম্পাদিত গবেষণা-গ্রন্থাদি

11. Life Movements in Plants : Transactions of the Bose Research Institute—Vol. I (1918) - 251 Pages, including 21 Papers, 92 illustrations.
12. Do Vol. II (1919)—344 Pages, including 30 Papers, 128 illustrations.
13. Do Vol. III (1920) } together.
14. Do Vol. IV (1921) }
15. The Physiology of the Ascent of Sap : Transactions of thd Bose Research Institute : Vol. V (1923). Cossim-bazar Endowment Publication.

16. Life Movements in plants : Vol. VI (1930-31).
17. Transactions of the Bose Research Institute Vol. VII (1931-32).
18. " Vol. VIII (1932-33)
19. " " IX (1933-34).
20. " " X (1934-35).
21. " " XI (1935-36).

বাংলা পুস্তক

22. অব্যক্ত (আশ্বিন, ১৩২৮)—এই পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে।

[যুক্তকর; আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ; গাছের কথা; উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু; মন্ত্রের সাধন; অদৃশ্য আলোক; পলাতক তুফান; অগ্নি পরীক্ষা; ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে; বিজ্ঞানে সাহিত্য (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ); নির্বাক জীবন; নবীন ও প্রবীণ (সাহিত্য পরিষদে সভাপতির অভিভাষণ); বোধন (বিক্রমপুর সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ); মনন ও কারণ; রাণী সন্দর্শন; নিবেদন (বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে); দীক্ষা; আহত উদ্ভিদ; স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ; হাজির]।

পরিশিষ্ট (ঙ)

মান্দ্রাজের জি, এ, নটেশন এণ্ড কোং প্রকাশিত 'Sir Jagadish Chandra Bose, His life, Discourses and Writings' পুস্তকে আচার্য বসু প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর এক তালিকা ও বিবরণ আছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি, এমন বক্তৃতা বা প্রবন্ধের তালিকা তা থেকে প্রদত্ত হল।

বাংলায়

ইংরাজী তারিখ	স্থান	বিষয়
১৪ই এপ্রিল, ১৯১১	ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন	আবিষ্কার বিষয়
১৫ই " "	"	"
মে, ১৯২০	বসু-বিজ্ঞান-মন্দির	The power of will (বাংলায়)
	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	সম্বর্ধনার উত্তর

ইংরাজীতে

Sept., 1913.	Bengal Educational Journal.	Comparative values of teaching & research, the two primary functions of a University.
18. 12. 1913.	Royal Com. on Public Services in India.	Evidence.
5. 2. 1914.	University Institute	Death Spasms in plant.
16. 12. 1915.	A speech at the entertainment arranged in the Presidency College on his return from a successful tour of Europe, America & Japan.	
March, 1916.	Benares Hindu University.	From the voiced to the Unvoiced.
25. 2. 1917.	Presidency College,	A speech at the congratulation meeting for his knighthood.
	Sadler Com. 1917-19.	Evidence.
Feb., 1917.	Modern Review.	The History of a failure that was great,
Nov., 1917.	Bose Institute.	The inaugural address.
Jan., 1918.	" (Lord Ronaldsay presided).	The praying palm tree.
18. 1. 1918.		The magnetic Crescograph
31. 1. 1918.	Bombay University	The unity of life.
৫. 2. 1918.	Bose Institute.	The automatic writing of the plant.

30. 11. 1918.		Control of nervous impulse.
24. 1. 1919.	Bose Institute.	Waking and sleeping of plants.
7. 2. 1919.	"	Wounded plants
Jan.,, 1921.	"	A message to scholars.
"	St. Xavier's College Bombay.	Science and Research.
25th Jan., 1921.	Town Hall.	Reply to reception.
4. 2. 1921.		The surge of life.
25. 2. 1921,	Bose Institute.	Sense organ of plants.
12. 4. 1921.	Rotary club, Cal.	

পরিশিষ্ট (চ)

উদ্ভিদ্ বিষয়ক আবিষ্কারের জন্য—জগদীশচন্দ্র-উদ্ভাবিত যন্ত্রের তালিকা

1. Single lever twentyfour hours' oscilating, plate recorder.
2. Apparatus for recording the autonomous pulsatory movement of Desmodium gyrans.
3. Compound lever Crescograph for recording plant. growth.
4. Balanced Crescograph.
5. Resonant recorder.
6. Photosynthesis recorder.
7. Plant death recorder.
8. Balanced potometer.
9. Plant sphygmograph.
10. Electric probe apparatus.
11. Magnetic Crescograph.
12. Exudation recorder.

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত

"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীরাজশেখর বসু—"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" বই পড়ে আনন্দিত হলাম। তাঁর জীবন চরিত অনেক প্রকাশিত হয়েছে। এই বই এর মতন সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ আর কোথাও দেখি নি। ভাষাও মনোহর। মনে হয় এই বই স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ অথবা পারিতোষিক গ্রন্থ হবার যোগ্য।...

স্যার ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—অতি সুপাঠ্য এই বই।

অধ্যক্ষ প্রিয়দারঞ্জন রায়— ...পাঠ করে তৃপ্তিলাভ করেছি। লেখা সহজ সরল ও সুখপাঠ্য হয়েছে।...আচার্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য এই বইখানি মূল্যবান।...

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' অতি সুন্দর হইয়াছে।...

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়—পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। আচার্য জীবনের বৃহৎ কথা সুনিপুণভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইখানি মনোরম হইয়াছে।..

ডাঃ হরগোপাল বিশ্বাস—জীবনী লিখিয়া শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ এর স্পেশাল অফিসার **শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস**—পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই।...

ভারতবর্ষ— ...প্রত্যেক পংক্তিতে আচার্য সম্বন্ধে নূতন কথা আছে, অথচ ইহা তথ্য সংগ্রহ মাত্র নহে।...

শনিবারের চিঠি— .. স্বল্প আয়তনের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মহৎ গুণাবলীর ঐকান্তিক লেখা-চিত্র অঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন।...

জ্ঞান ও বিজ্ঞান— ...এরূপ তথ্যসমৃদ্ধ সহজলভ্য একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।..

আনন্দবাজার— ...জীবনপঞ্জী ও পরিশিষ্ট বইখানির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।...

প্রবাসী— ...ভাষা ভাল। সব কথা গুছাইয়া বলিবার মুন্সিয়ানা আছে।...

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি এস-সি প্রণীত

'TWO NEW PALA RECORDS' সম্বন্ধে অভিমত

Sir Jadunath Sarkar : ...The value of his printed studies on this subject has been enhanced by the new problems he has posed, and hints he has thrown out for research in certain new directions....

Prof. Dinesh Chandra Bhattacharjya : No orthodox epigraphist could have done better than what Sj. Gupta has done....

Dr. D. C. Sircar : ...Your treatment of the Epigraph a success and your discussion of Geographical names in the inscriptions very interesting....

Prof. Prabodh Ch. Sen : ...Shri Monoranjan Gupta has won for his work a place in the future reconstruction of the early History of Bengal....

Sri Jogendra Nath Gupta : Your reading is accurate and identification of the places seems to be correct....

Dr. J. N. Banerjee : ...Gupta's researches has challenged the views of previous scholars....

Prof. Chintaharan Chakravorty : I heartily congratulate you for your critical study....

Dr. Niharranjan Ray : His is no amateurist attempt at historical and archaelogical research....

Dr. L. Renou (Paris) : ...It is a very accurate work and I think your identification cannot easily be rejected.

Dr. L. D. Barnet (London) : It is indeed a valuable contribution to the history of the brilliant Pala period.

Mr. J. Allen (Edinburgh) : ...Fills a gap in our knowledge of the mediaeval history of Bengal.

Dr. U. N. Ghosal : ...the admirable manner in which these problems have been tackled by the author....

etc. etc. etc.